রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে বৌদ্ধ প্রভাব সমীক্ষা

বরুন তালুকদার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

মে-২০২৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

এই মর্মে প্রত্যায়ন করছি যে, *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে বৌদ্ধ প্রভাব সমীক্ষা* শিরোনাম শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক রচনা। পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়ার তত্ত্বাবধানে আমি অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছি। এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

বরুন তালুকদার
এম. ফিল গবেষক
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যায়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যায়ন করা যাচ্ছে যে, বরুন তালুকদার কর্তৃক উপস্থাপিত *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে বৌদ্ধ প্রভাব সমীক্ষা* শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া
তত্ত্বাবধায়ক
প্রাক্তন চেয়ারম্যান
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য (মে-২০২৩) উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

শিরোনাম : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে বৌদ্ধ প্রভাব সমীক্ষা

বরুন তালুকদার

এম.ফিল গবেষক

পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে বৌদ্ধ প্রভাব সমীক্ষা

(সারসংক্ষেপ)

১. ভূমিকা

বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির এক মহাপ্লাবণের যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সৃষ্টি। এজন্য বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। চর্যাপথ, নাথ-সাহিত্য, শূণ্যপুরাণ, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, শাক্ত পদাবলী এবং বাউলগানে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের বিষয়বস্তুগত এবং ভাবগত প্রভাব রয়েছে। আধুনিককালের বহু কবি সাহিত্যিক বৌদ্ধ ভাবধারা গ্রহণ করে মননশীল সাহিত্যকর্ম রচনা করেছেন। বৌদ্ধ চিন্তাধারা বা ভাবধর্ম এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকেই সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাবিত করেছে। ছড়া, কবিতা, গল্প, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, গীতিনাট্য প্রভৃতি রচনা করে তিনি বাংলা সাহিত্যকে নানা আঙ্গিকে ঋদ্ধ করেছেন। তাঁর অমর সৃষ্টি তাঁকে বাংলাসাহিত্যেও কালজয়ী মহাপুরুষে পরিণত করেছেন। "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে বৌদ্ধ প্রভাব সমীক্ষা" শীর্ষক বিষয়ে এ অভিসন্দর্ভের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট বৌদ্ধ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনার ক্ষেত্রেও সত্য। জানা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে পালি ভাষা ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের তিনি বিশ্বভারতীতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতেন এবং শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধধর্ম চর্চার জন্য সিংহল প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশে প্রেরণ করেন। তিনি নিজে বহু বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, যা তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রেরণা যুগিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত নাটকসমূহে বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও ভাবধর্ম চিহ্নিত করাই আমার গবেষণাকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্যে। বিশেষত তিনি কোন্ কোন্ বৌদ্ধ উৎস হতে ভাব গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর রচিত নাটকসমূহে বৌদ্ধ ভাবাদর্শ কীরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে তা অন্বেষণ করাই এ গবেষণার মৌল অভীক্ষা।

Dhaka University Institutional Repository

৩. গবেষণার পরিধি

বাংলাদেশে বিভিন্ন গবেষক রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষণা করলেও প্রস্তাবিত বিষয়ে সূচারুরূপে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়নি। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে পালি ভাষায় দক্ষতার অভাব এবং পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধ সাহিত্যের দুষ্প্রাপ্যতা। বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দুর্লভ তথ্যসমূহ সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। ফলে আলোচ্য বিষয়ে গবেষণা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হলে বৌদ্ধ ও বাংলা সাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বহু অজানা তথ্য উদ্‌ঘাটিত হবে, যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। এ কারণে বলা য়ায়, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে বৌদ্ধ প্রভাব সমীক্ষা" শিরোনাম শীর্ষক প্রস্তাবিত বিষয়টি গবেষণার বিষয় হিসেবে যথেষ্ট উপযোগিতা রয়েছে।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

প্রস্তাবিত অভিসন্দর্ভটি মূলত সাহিত্য নির্ভর এবং বিবৃতিমূলক। এ কারণে তুলনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতি গ্রহণ করে অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছি। এছাড়া, মৌলিক এবং দ্বৈতিয়িক উৎস তথা দেশ-বিদেশের বিদগ্ধ পণ্ডিতদের পবেষণাকর্ম হতে তথ্য ও উদ্ধৃতি গ্রহণ করে আলোচ্য বিষয়বস্তুর যথার্থতা প্রতিপাদন করেছি।

৫. অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

বিষয়বস্তুকে চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছি। প্রথম অধ্যায়ে বৌদ্ধ সাহিত্যের পরিচয় তুলে ধরেছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন্ কোন্ সাহিত্যকর্ম হতে ভাবধারা গ্রহণ করে নাটক রচনা করেছেন তা চিহ্নিত করার সুবিধার্থে প্রথম অধ্যায়ে বৌদ্ধ সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেছি। পর্যালোচনায় দেখা যায়, বৌদ্ধ সাহিত্য দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত। যথা : পালি সাহিত্য এবং বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য। পালি ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ পালি সাহিত্য, অপরদিকে সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ সংস্কৃত সাহিত্য নামে অভিহিত। উভয় ধারায় বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার রয়েছে। বিষয়বস্তুর আঙ্গিকে পালি সাহিত্যকে নিম্নরূপভাবে ভাগ করা যায় :

ত্রিপিটক : পালি সাহিত্যের মধ্যে সর্ব প্রাচীন হচ্ছে ত্রিপিটক। ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। ত্রিপিটকে গৌতম বুদ্ধের সকল ধর্মবাণী সংকলিত আছে। ত্রিপিটক তিনটি প্রধানভাগে বিভক্ত। যথা : সূত্র পিটক, বিনয় পিটক এবং অভিধর্ম পিটক। বুদ্ধ সূত্রাকারে যেসব ধর্মবাণী দেশনা করেছেন তা সূত্র নামে অভিহিত। সূত্রসমূহ সূত্রপিটকে সংকলিত আছে। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীসংঘের জীবনকে বিশুদ্ধভাবে পরিচালিত করার জন্য বুদ্ধ অনেকগুলো বিধি-বিধান বা নিয়ম প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন, যা বিনয় নামে অভিহিত। বিধি-বিধান বা

বিনয়গুলো বিনয় পিটকে সংকলিত আছে। বুদ্ধের দর্শন বিষয়ক আলোচনাসমূহ অভিধর্ম নামে অভিহিত, যা অভিধর্ম পিটকে সংকলিত আছে। ত্রিপিটকে অনেকগুলো গ্রন্থের সমাহার রয়েছে। নিচে ত্রিপিটকের গ্রন্থসমূহ তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করে ছকে প্রদর্শন করা হলো :

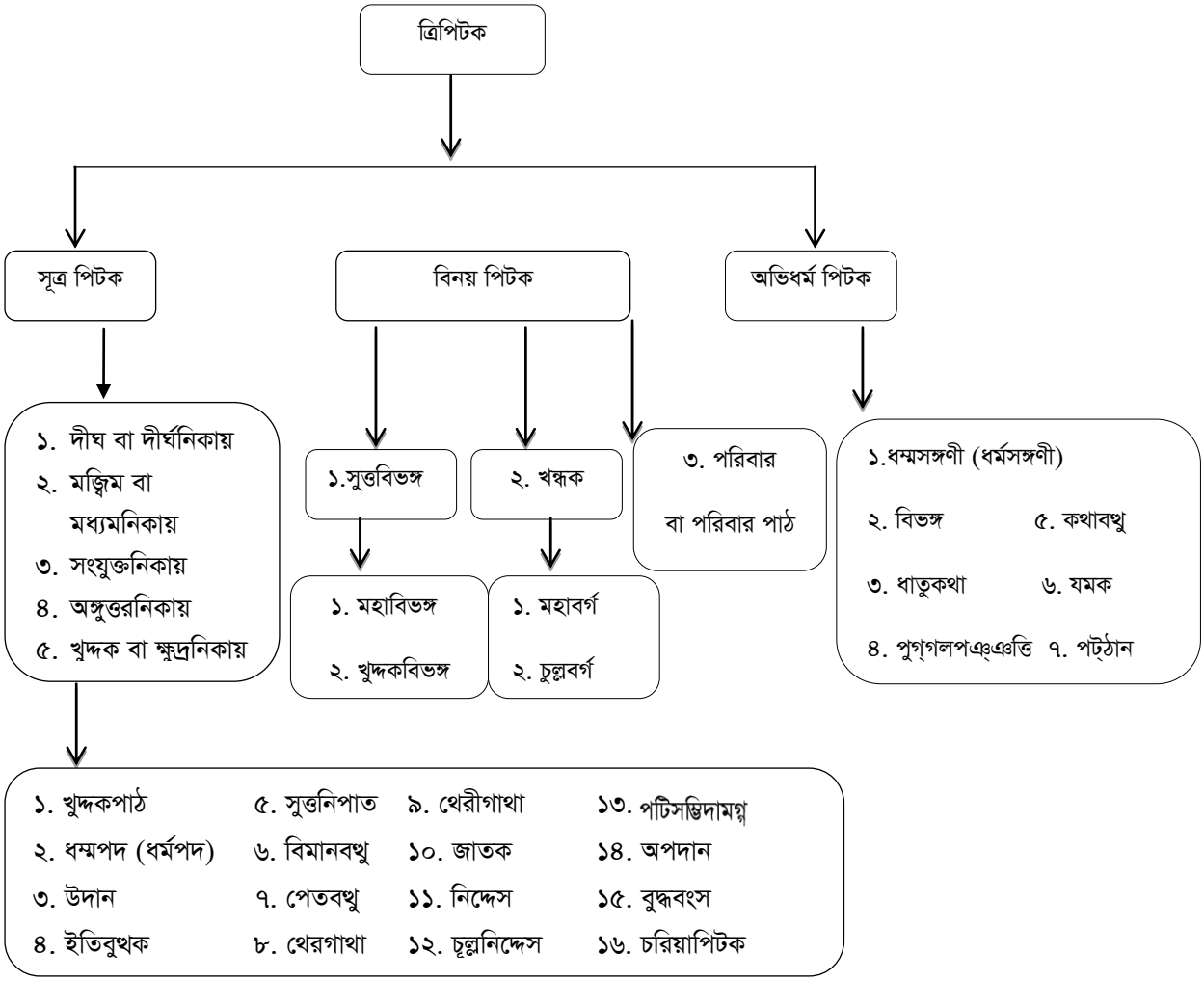

ত্রিপিটক বর্হিভূত মৌলিক গ্রন্থ : ত্রিপিটকে পরবর্তীকালে এবং অট্ঠকথার পূর্বে বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের বিশ্লেষণধর্মী এক প্রকার রয়েছে, যা ত্রিপিটক বর্হিভূত মৌলিক গ্রন্থ নামে পরিচিত। এরূপ গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : সুত্তসংগহ, পেটকোপদেস, নেত্তিপকরণ এবং মিলিন্দপঞ্ঞ।

অট্ঠকথা : ত্রিপিটকে সংকলিত বুদ্ধবাণীতে অনেক দুর্বোধ্য, দ্ব্যর্থক ও জটিল বিষয় রয়েছে। সেসব বিষয়ের সহজ-সরল ব্যাখ্যাস্বরূপ পালি ভাষায় এক ধরণের সাহিত্যকর্ম রচিত হয়, যা অট্ঠকথা নামে পরিচিত। ত্রিপিটকের সকল গ্রন্থের অট্ঠকথা রচিত হয়েছে। বুদ্ধঘোষ, বুদ্ধদত্ত, ধর্মপাল, উপসেন, মহানাম প্রমুখ মহাপণ্ডিতগণ অট্ঠকথাসমূহ রচনা করেন।

টীকা-অনুটীকা : অট্ঠকথায় বর্ণিত বিষয় নিয়েও পালি ভাষায় সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছে, যা টীকা-অনুটীকা নামে পরিচিত। সমীক্ষায় দেখা যায়, পালি ভাষায় রচিত **১৩**টি টীকা গ্রন্থ এবং ৪টি অনুটীকা গ্রন্থ রয়েছে।

বংসসাহিত্য : পালি ভাষায় ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নিয়ে এক প্রকার সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছে, যা বংসসাহিত্য নামে পরিচিত। এ ধরণের গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : দীপবংস, মহাবংস, গন্ধবংস, সদ্ধম্মসংগহ, সাসনবংস ইত্যাদি।

এছাড়া, পালি ভাষায় সারগ্রন্থ, সংকলনগ্রন্থ, অধিবিদ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থ, কাব্য গ্রন্থ, গল্পসংগ্রহ, ব্যাকরণ ও শব্দকোষ, ছন্দ-অলংকার, নীতিশাস্ত্র, জীবনী গ্রন্থ, চিঠি-অনুশাসন, দর্শন, কানুনিক প্রভৃতি ধরণের গ্রন্থও রচিত হয়।

অপরদিকে, বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যও নানা আঙ্গিকের বিষয়বস্তুর সমাহারে ঋদ্ধ। সংস্কৃত ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। পালি সাহিত্যভাণ্ডার অপেক্ষা বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারের পরিধি বহুগুণ বিস্তৃত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ললিতবিস্তর, মহাবস্তু, বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ, সদ্ধম্মপুণ্ডরিক, সুখাবতিব্যুহ, প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র, লংকাবতার সূত্র, সুবর্ণপ্রভাস সূত্র, কারণ্ডব্যুহ সূত্র, গণ্ডব্যুহ সূত্র, মাধ্যমিককারিকা, বোধিচর্যাবতার, শিক্ষাসমুচ্চয়, অভিধর্মকোষ, অবদানশতক, অশোকাবদান, অবদানকল্পলতা, দিব্যাবদান ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বৌদ্ধ সাহিত্য বৈচিত্র্যময় এবং নানা আঙ্গিকের সাহিত্য রচনার অনন্য উৎস।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিতে বুদ্ধ' সম্পর্কে আলোচনা করেছি। বুদ্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তা-চেতনা কিরূপ ছিল এবং বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন তাঁর মননে কীরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল তা অনুসন্ধান করার জন্য এই অধ্যায়টি অবতারণা করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনা থেকে জানা যায় যে, বুদ্ধের জীবন-দর্শন রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান, নাটক, গল্প, উপন্যাস, গীতি-নাট্য এবং চিন্তন ও মননে বৌদ্ধ ভাবাদর্শ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধ মূল্যবোধ ও ভাবাদর্শ তাঁর চিন্তা-চেতনাকে বিমোহিত করেছিল বলেই তিনি বুদ্ধকে আদর্শ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং দ্ব্যর্থকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন :

পাষাণের মৌনতটে যে-বাণী রয়েছে চিরস্থির–

কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর

Dhaka University Institutional Repository

আকাশে উঠিছে অবিরাম

অমেয় প্রেমের মন্ত্র– 'বুদ্ধের স্মরণ লইলাম।'

তৃতীয় অধ্যায়ে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্মে বৌদ্ধ প্রভাব' সম্পর্কে আলোচনা করেছি। নাটক ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সাহিত্যকর্মে বৌদ্ধ প্রভাব রয়েছে কিনা তা জানার জন্য এই অধ্যায়টি উপস্থাপন করেছি। সমীক্ষায় দেখা যায়, ররীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার বৌদ্ধ সংস্কৃতির বলয়ে ছিল আচ্ছন্ন। তিনি নিজেও বৌদ্ধ সংস্কৃতির লালন ক্ষেত্রসমূহ আন্তরিকতার সঙ্গে পরিভ্রমণ করেছেন। বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যন্য উপাদান বা মূল্যবোধগুলো, বিশেষত সাম্যবাদ, উদারতা, সহিষ্ণুতা, মানবতাবাদ, সর্বপ্রাণীর কল্যাণ কামনা প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, যা তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মে নানাভাবে প্রতিভাত করেছেন। বৌদ্ধ সাহিত্যের উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ তাঁর সাহিত্যে এক বিশেষ জায়গা দখল করে আছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে মূল আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে বৌদ্ধ প্রভাব সম্পর্কে সমীক্ষা করেছি এবং উক্ত সমীক্ষার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কোন নাটক কোন কোন বৌদ্ধ উৎস হতে ভাব গ্রহণ করে রচিত হয়েছে তা চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা করেছি। উক্ত বিষয়ে আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকসমূহের মধ্যে রাজা, মালিনী, নটীর পূজা, চণ্ডালিকার কাহিনী, ধরন, চরিত্র বৌদ্ধ সংস্কৃতি কেন্দ্রিক। উক্ত নাটকসমূহের মূল উৎস হচ্ছে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধ অবদানশতক গ্রন্থ। উক্ত নাটকসমূহে তিনি সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বৈষম্য ও কুসংস্কারের বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ অচলায়তন নাটকের উৎস গ্রহণ করেছেন দিব্যাবদান গ্রন্থ হতে। এই নাটকে গণ্ডিবদ্ধ শিক্ষার অচলায়তন ভেঙ্গে বৌদ্ধ ভাবাদর্শের শিক্ষার দ্বারকে উন্মুক্ত করা হয়েছে। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, যে শিক্ষা চিত্ত জগতকে জাগরিত করে না এবং বিমুক্ত করে না সেই শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নয়। রবীন্দ্রনাথ 'রাজা' নাটকটি কুশ জাতক হতে কাহিনী সংগ্রহ করে রচনা করেছেন। উক্ত নাটকের কাহিনী সংস্করণ করে তিনি অরূপরতন নাটকটি রচনা করেন। নটীর পূজা নাটকের উৎসও রবীন্দ্রনাথ অবদানশতক গ্রন্থ হতে সংগ্রহ করেছেন। চণ্ডালিকা নাটকটি অবদান শতকের শার্দূল-কর্ণাবদান কাহিনীর আলোকে রচিত। এই নাটকে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ লক্ষ করা যায়, যা বুদ্ধের জীবন-দর্শনের অনন্য বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে বলা যায়, বুদ্ধের জীবন-দর্শনের বিশেষত্ব হচ্ছে সার্বজনীনতা, যা রবীন্দ্রনাথের নাটকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। বুদ্ধের চারি অপ্রেমেয় দর্শন অর্থাৎ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

পরিশেষে উপসংহারে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করেছি। প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের অধিকাংশ কাহিনীই বৌদ্ধ সাহিত্য হতে সংগ্রহ করেছেন এবং বৌদ্ধ মূল্যবোধ, যেমন– সাম্যবাদ, উদারতা, সহিষ্ণুতা, মানবতাবাদ, সর্বপ্রাণীর কল্যাণ কামনা প্রভৃতি তাঁর নাটকের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
	প্রসঙ্গকথা	০৫
	অবতরণিকা	০৬-০৭
প্রথম অধ্যায়	বৌদ্ধ সাহিত্য পরিচিতি	০৮-৩৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিতে বুদ্ধ	৪০-৬১
তৃতীয় অধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্মে বৌদ্ধ প্রভাব	৬২-৮৭
চতুর্থ অধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে বৌদ্ধ প্রভাব	৮৮-১১৫
	উপসংহার	১১৬-১২০
	গ্রন্থপঞ্জি	১২১-১২৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

আমার এম.ফিল গবেষণার শিরোনাম *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে বৌদ্ধ প্রভাব সমীক্ষা*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধীনে আমি উপরি-উক্ত শিরোনামে এম.ফিল গবেষণার ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে নিবন্ধন লাভ করি। পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের শ্রদ্ধাভাজন প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর তত্ত্বাবধানে আমি অভিসন্দর্ভটি রচনা করি। জীবনে নানারকম প্রতিকূলতা তথা বৈশ্বিক কোভিট মহামারিতে বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও আমি এটি মূল্যায়ন করার জন্য উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। আমার এ অভিসন্দর্ভের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপরেখা নির্মাণে শ্রদ্ধাভাজন প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়ার উৎসাহ, পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা আমি গভীর শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতাচিত্তে স্মরণ করি। তাঁর সুনিপুণ গবেষণার গভীরতা, পাণ্ডিত্য, সুচিন্তিত পরামর্শ, সঠিক নির্দেশনা ও আন্তরিকতা আমার গবেষণাকর্মকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর আন্তরিকতা ও সহযোগিতায় ধন্য এবং এছাড়া আরো দুইজন শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া ও সহযোগী অধ্যাপক ড. নীরু বড়ুয়ার কাছে আমি ঋণী। আমার গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁরা যেভাবে পরামর্শ ও আন্তরিকতা দেখিয়েছেন, তা কখনো ভুলবার নয়। আমাকে গবেষণার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রবীণ সম্মানিত শিক্ষক ও সুধীজন তাঁদের পর্বতসম প্রাজ্ঞময় পরামর্শ দিয়ে বাধিত করেছেন। তাঁরা হলেন আমার বিভাগের সম্মানিত প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. বেলু রানী বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া, সহযোগী অধ্যাপক ড. শান্টু বড়ুয়া, ড. মৈত্রী তালুকদার এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া, প্রাচ্যভাষা বিভাগের অধ্যাপক ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. জিনবোধি ভিক্ষু, অধ্যাপক ড. জ্ঞানরত্ন থের, অধ্যাপক বনশ্রী মহাথের, আচারিয় সুগতশ্রী মহাস্থবির, ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারের অধ্যক্ষ বুদ্ধপ্রিয় মহাথের, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. জগন্নাথ বড়ুয়া। সবশেষে স্মরণ করি আমার গৃহীজীবনের বড় ভাই অরুন তালুকদার ও স্ত্রী শিল্পী তালুকদারকে; যাদের অবিরত উৎসাহ আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদনে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। এছাড়া আমার বিভাগের কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ বড়ুয়া, বিটু বড়ুয়া, অভি বড়ুয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে কর্মরত সহায়তাকারী কর্মকর্তাসহ এবং কম্পিউটার কম্পোজে সহযোগিতাকারীদের কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি।

অবতরণিকা

১. ভূমিকা

বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির এক মহাপ্লাবণের যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সৃষ্টি। এজন্য বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। চর্যাপথ, নাথ-সাহিত্য, শূণ্যপুরাণ, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, শাক্ত পদাবলী এবং বাউলগানে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের বিষয়বস্তুগত এবং ভাবগত প্রভাব রয়েছে। আধুনিককালের বহু কবি সহিত্যিক বৌদ্ধ ভাবধারা গ্রহণ করে মননশীল সাহিত্যকর্ম রচনা করেছেন। বৌদ্ধ চিন্তাধারা বা ভাবধর্ম এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকেই সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাবিত করেছে। ছড়া, কবিতা, গল্প, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, গীতিনাট্য প্রভৃতি রচনা করে তিনি বাংলা সাহিত্যকে নানা আঙ্গিকে ঋদ্ধ করেছেন। তাঁর অমর সৃষ্টি তাঁকে বাংলাসাহিত্যেও কালজয়ী মহাপুরুষে পরিণত করেছেন। "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে বৌদ্ধ প্রভাব সমীক্ষা" শীর্ষক বিষয়ে এ অভিসন্দর্ভের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট বৌদ্ধ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনার ক্ষেত্রেও সত্য। জানা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে পালি ভাষা ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের তিনি বিশ্বভারতীতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতেন এবং শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধধর্ম চর্চার জন্য সিংহল প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশে প্রেরণ করেন। তিনি নিজে বহু বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, যা তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রেরণা যুগিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত নাটকসমূহে বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও ভাবধর্ম চিহ্নিত করাই আমার গবেষণাকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্যে। বিশেষত তিনি কোন্ কোন্ বৌদ্ধ উৎস হতে ভাব গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর রচিত নাটকসমূহে বৌদ্ধ ভাবাদর্শ কীরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে তা অন্বেষণ করাই এ গবেষণার মৌল অভীক্ষা।

৩. গবেষণার পরিধি

বাংলাদেশে বিভিন্ন গবেষক রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষণা করলেও প্রস্তাবিত বিষয়ে সূচারুরূপে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়নি। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে পালি ভাষায় দক্ষতার অভাব এবং পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধ সাহিত্যের দুষ্প্রাপ্যতা। বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দুর্লভ তথ্যসমূহ সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। ফলে আলোচ্য বিষয়ে গবেষণা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হলে বৌদ্ধ

ও বাংলা সাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বহু অজানা তথ্য উদঘাটিত হবে, যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। এ কারণে বলা য়ায়, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে বৌদ্ধ প্রভাব সমীক্ষা" শিরোনাম শীর্ষক প্রস্তাবিত বিষয়টি গবেষণার বিষয় হিসেবে যথেষ্ট উপযোগিতা রয়েছে।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

প্রস্তাবিত অভিসন্দর্ভটি মূলত সাহিত্য নির্ভর এবং বিবৃতিমূলক। এ কারণে তুলনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতি গ্রহণ করে অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছি। এছাড়া, দ্বৈতীয়িক উৎস তথা দেশ-বিদেশের বিদগ্ধ পণ্ডিতদের পবেষণাকর্ম হতে তথ্য ও উদ্ধৃতি গ্রহণ করে আলোচ্য বিষয়বস্তুর যথার্থতা প্রতিপাদন করেছি।

৫. গবেষণার গঠনশৈলী

বিষয়বস্তুকে চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। প্রথম অধ্যায়ে বৌদ্ধ সাহিত্যের পরিচয় তুলে ধরেছি। এখানে বৌদ্ধ সাহিত্য বলতে পালি এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে বোঝানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন্ কোন্ সাহিত্যকর্ম হতে ভাবধারা গ্রহণ করেছে তা চিহ্নিত করার সুবিধার্থে প্রথম অধ্যায়ে বৌদ্ধ সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিকে বুদ্ধ' সম্পর্কে আলোচনা করেছি। বুদ্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তা-চেতনা কিরূপ ছিল এবং বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন তাঁর মননে কীরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল তা অনুসন্ধান করার জন্য এই অধ্যায়টি অবতারণা করেছি। তৃতীয় অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্মে বৌদ্ধ প্রভাব' সম্পর্কে আলোচনা করেছি। নাটক ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সাহিত্যকর্মে বৌদ্ধ প্রভাব রয়েছে কিনা তা জানার জন্য এই অধ্যায়টি উপস্থাপন করেছি। চতুর্থ অধ্যায়ে মূল আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে বৌদ্ধ প্রভাব সম্পর্কে সমীক্ষা করেছি এবং উক্ত সমীক্ষার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কোন নাটক কোন কোন বৌদ্ধ উৎস হতে ভাব গ্রহণ করে রচিত হয়েছে তা চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা করেছি। পরিশেষে উপসংহার গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করেছি। এছাড়া, পরিশেষে, গ্রন্থপঞ্জি সংযোজন করে অভিসন্দর্ভটি কোন কোন উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে রচিত হয়েছি তার পরিচয় তুলে ধরেছি।

৬. প্রত্যাশা

আমি মনে করি নিরলস প্রচেষ্টা সত্বেও আমার অভিসন্দর্ভে কিছু অপূর্ণতা রয়ে গেছে। ভবিষ্যতে কোনো একজন গবেষক সেই অপূর্ণ বিষয় পরিপূর্ণতায় ভরে তুলবে – এই প্রত্যাশা রইল।

প্রথম অধ্যায়

বৌদ্ধ সাহিত্য পরিচিতি

প্রাক্-বুদ্ধ ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে বৈদিক এবং বেদ সাহিত্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল বলে বৌদ্ধ সাহিত্য তথ্য থেকে অনুমান করা যায়। বৌদ্ধ সাহিত্য শুধু বুদ্ধের সমকালীন ছিল তা নয়, ভারতের সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান লক্ষ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ সাহিত্যের সূচনার যাত্রা মহামানব গৌতম বুদ্ধের প্রথম সূত্র ধর্মপ্রবর্তন সময়কাল থেকে। গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর হতে প্রথমে তাঁর শিষ্যপরম্পরা বুদ্ধবাণী সংকলন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। বৌদ্ধ ইতিহাস ঐতিহ্যনুসারে বুদ্ধ ৮০ বছর জীবিত ছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর জন্ম। খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দে।[১] শাক্যপুত্রীয় রাজসন্ন্যাস সিদ্ধার্থ গৌতম রাজ্যসুখ ত্যাগ করে বিভিন্ন স্থানে ছয় বছর কঠোর ধ্যান শেষে বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষতলে মানবতার শান্তি ও সমৃদ্ধির বাণী সত্যজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মানবের দুঃখমুক্তির উপায় আবিষ্কার করলেন, জগতখ্যাত বুদ্ধ নামে খ্যাত হলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর দিকে সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে তথাগত বুদ্ধ ভারত তথা বিশ্বে বহুজনের সুখ ও শান্তির জন্য উপদেশ বাণী প্রচারে বিস্তৃতি লাভ করলেন। বুদ্ধের জীবদ্দশায় কোনো ত্রিপিটক সংকলন হয়নি। তবে পণ্ডিতদের ধারণানুযায়ী ত্রিপিটকের সূত্র, বিনয়গুলো অনেকটা বুদ্ধের মুখনিঃসৃত উপদেশ ও নির্দেশিত বাণী। বুদ্ধের উপদেশ বাণীর কখন, কোথায়, কোন প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন তার নির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ নাই। মহাপরিনির্বাণের পূর্বে বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘদেরকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছেন, তা 'বুদ্ধবচন' নামে খ্যাত। এই উপদেশ বাণীগুলো বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য, তিব্বতী ও চীনা অনুবাদেও পাওয়া যায়। বুদ্ধ জীবনাদর্শ ও উপদেশবাণী ভিক্ষুসংঘ তথা গৃহিদের জীবনাচরণ কীভাবে পরিচালিত করবেন তা দেশনা আকারে উপদেশ দিয়েছেন। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে ধর্মদেশনা, উপদেশ, গীতিকাব্য, আখ্যান ও ভিক্ষুসংঘের বিভিন্ন নিয়মাবলি গ্রন্থাকারে রচিত বা সংকলন করা হয়েছে তা শুধু ত্রিপিটকের পরে নয়, তারও পূর্বে সংকলিত হয়েছে। বৌদ্ধশাস্ত্রবিদদের রচিত বৌদ্ধ সাহিত্য আলোচনা থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পরে বুদ্ধের শিষ্য মহাকশ্যপের সভাপতিত্বে পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষুদের উপস্থিতিতে রাজগৃহে সপ্তপর্ণী গুহায় সূত্রধর আনন্দ ও বিনয়ধর উপালির বদান্যতায় প্রথম সঙ্গীতির আয়োজন হয়েছিল। শ্রীলংকার তথ্য বা কাহিনী ও বিনয় পিটকের গ্রন্থানুসারে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশত বছর পর বৃজিপুত্রীয় ভিক্ষুদের দশটি বিনয় বহির্ভূত আচরণের কারণে বৈশালীর বালুকারামে মগধের রাজা কালাশোকের শাসনামলে আয়ুস্মান যশ স্থবিরের অনুপ্রেরণায় সাতশত অর্হৎ ভিক্ষুদের উপস্থিতিতে দ্বিতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। সে সঙ্গীতিতে রেবত স্থবিরের সভাপতিত্বে প্রায় আট মাসব্যাপী বিভিন্ন ধর্ম-বিনয়ের উপর আলোচনা করা

হয়। মূলত দ্বিতীয় সঙ্গীতির পর থেকে ভিক্ষুদের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত শুরু হয় এবং কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। শ্রীলংকার ইতিহাসের আলোকে বৃজিপুত্রীয় ভিক্ষুরা আরেকটি সম্মেলনের আহবান করে, যা মহাসঙ্গীতি নামে খ্যাত। এই মহাসঙ্গীতিতে যারা ভিক্ষুসংঘ উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা মহাসাংঘিক[২] নামে পরিচিতি লাভ করলেন। প্রাচীনপন্থী ভিক্ষুদেরকে থেরবাদী বা স্থবিরবাদী নামে অভিহিত করা হয়। দীপবংশ গ্রন্থের বিবরণীর মতে,[৩] সেই সময়ে অভিধর্ম পিটকের কোনো রচনার অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর দিকে মোগ্‌গলিপুত্র তিষ্য স্থবিরের সভাপতিত্বে পাটলিপুত্র নগরে তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে সেই সঙ্গীতিতে প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতির আলোচ্য ধর্ম-বিনয় বিষয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তৃতীয় সঙ্গীতির সময়কালে অভিধর্ম পিটকের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। তৃতীয় সঙ্গীতির পটভূমিতে প্রজাদের মধ্যে সম্রাট অশোকের দানের পৃষ্ঠপোষকতা ভিক্ষুদের মর্যাদা অনেকাংশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে অভিক্ষুরা সুযোগ সুবিধা পাওয়ার আশায় নিজেরা চীবর গ্রহণ করে প্রকৃত ভিক্ষু বলে পরিচয় দিতে লাগল। তাঁরা ধর্মকে অধর্ম এবং অধর্মকে ধর্ম বলে প্রচার করতে থাকে। এভাবে বিনয়বিরোধী ভিক্ষুদের দিনদিন প্রসারতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এতে প্রকৃত ভিক্ষুরা শঙ্কিত হয়ে পড়লেন এবং রাজার কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। সম্রাট অশোক তাঁদের কথা শুনে মর্মাহত হলেন। কীভাবে সেটির সমাধান করা যায় তার একটি উপায় বের করতে বললেন। প্রকৃত ভিক্ষুদের পরামর্শ মতে, রাজা সবাইকে রাজদরবারে আহবান করলেন এবং এক এক করে পর্দার আড়ালে নিয়ে বুদ্ধ কোন মতবাদী বলে জিজ্ঞাসা করেন। মিথ্যাপরায়ণ ভিক্ষুরা কেউ তাঁর সদুত্তর দিতে পারেন নাই। কেবল প্রকৃত ভিক্ষুরা বলেন বুদ্ধ বিভাজ্যবাদী ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, অশোকের শিলালিপি হতে জানা যায় পরবর্তী সময়ে সম্রাট অশোক নির্দেশ দিলেন মিথ্যাপরায়ণ ভিক্ষুদের শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে সংঘ সমাজ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য। শ্রীলংকার তথ্য মতে, মোগ্‌গলিপুত্র তিষ্য স্থবির সম্রাট অশোকের অনুপ্রেরণায় তৃতীয় সঙ্গীতির পর হতে বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত প্রেরণ করে ধর্ম প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সম্রাট অশোক মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রাকে শ্রীলংকায় প্রেরণ করে ধর্ম প্রচারের যাত্রা শুরু করেন। তৃতীয় সঙ্গীতিতে ত্রিপিটকের সূচনা বলে মনে করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, অশোকের শিলালিপি হতে জানা যায় তৃতীয় সঙ্গীতিতে কথাবত্থু গ্রন্থটিও রচিত হয় যা বর্তমানে পালি ত্রিপিটক নামে খ্যাত। ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে[৪] আমরা বুদ্ধবচনের নয়টি অঙ্গের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা :

১. সুত্ত (সুত্র) অর্থাৎ, গদ্যে ধর্মোপদেশ

২. গেয়্য অর্থাৎ, গদ্য ও পদ্যে মিশ্রিত ধর্মোপদেশ

৩. বেয্যাকরণ (ব্যাকরণ) অর্থাৎ, ব্যাখ্যা বা টীকা। বৌদ্ধ সংস্কৃত ও পালি নিদান কথায় ভবিষ্যদ্বাণী অর্থে বেয্যাকরণ শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে

৪. গাথা অর্থাৎ, ছন্দোবদ্ধ রচনা বা কবিতা

৫. উদান অর্থাৎ, সারবান সংক্ষিপ্ত আবেগময় কথা

৬. ইতিবুত্তক অর্থাৎ, ইহা ভগবান বলেছেন এরূপ ক্ষুদ্র ভাষণ

৭. জাতক অর্থাৎ, বুদ্ধের অতীত জীবনের কাহিনী

৮. অবভুতধম্ম (অদ্ভুদ ধর্ম) অর্থাৎ, অলৌকিক ক্রিয়ার বিবরণ ও

৯. বেদল্ল অর্থাৎ, প্রশ্নোত্তর বা কথোপকথনে ধর্মোপদেশ।

এই বুদ্ধবচনকে নবাঙ্গসত্থুসাসন বলে আখ্যায়িত করেন। নবাঙ্গ ত্রিপিটকের কোনো বিভাগ নয়, কোনো বিশেষ গ্রন্থও নয়। ইহাকে পালি শাস্ত্রের রচনা পদ্ধতি শ্রেণিবিভাগকে বোঝানো হয়েছে। নবাঙ্গ ছাড়াও বহু ক্ষুদ্র গ্রন্থ, বিনয়, সূত্র, কথিকা, নীতিমূলক গাথা বুদ্ধবচনরূপে ত্রিপিটকে উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ সাহিত্যকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভাজন করা হয়েছে। যথা : ১. শাস্ত্রীয় পালি ত্রিপিটক বৌদ্ধ সাহিত্য, ২. বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য, ৩. অবদান সাহিত্য, ৪. ত্রিপিটক-বহির্ভূত পালি সাহিত্য, ৫. পালি বংশ সাহিত্য, ৬. পালি অট্ঠকথা সাহিত্য। এসব বিভিন্ন শ্রেণির সাহিত্য বিভাগে বুদ্ধের উপদেশ, নীতি, আদর্শ, দর্শন, কৃষ্টি, সভ্যতা ও ঐতিহ্যের কথা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিচে তাদের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হলো :

'ত্রিপিটক' শব্দের অর্থ তিনটি পিটক যা সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম নামে খ্যাত। এখানে 'ত্রি'[৫] শব্দের অর্থ তিন আর 'পিটক' শব্দের অর্থ ঝুড়ি, পাত্র, পেটরা বা আধার। পালি সাহিত্যে[৬] পিটককে কোনো দ্রব্য রাখার ঝুড়ি বা পাত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। এটি তথাগত বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণীগুলো সংকলনের মাধ্যমে পিটকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তথাগত বুদ্ধ মহাপরির্নিবাণের দু'শ বছর পর সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহে এবং স্থবির মোগ্গলিপুত্ত তিসস (মোগ্গলিপুত্র তিষ্য) মহোদয়ের সভাপতিত্বে পাটলিপুত্র নগরীতে (বর্তমান পাটনায়) তৃতীয় মহাসঙ্গীতিতে সংকলিত সূত্র ও বিনয় পিটকের রচনা এবং অভিধর্ম পিটকের সংকলন হয়। বুদ্ধের উপদেশাবলিকে সূত্র বলা হয় অর্থাৎ, বুদ্ধবাণীর সাধারণ নাম 'সূত্র'। সুতরাং সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম সূত্রের অন্তর্গত। সূত্র পিটকে গৃহিদের প্রতিপাল্য নীতি সম্বন্ধে উপদেশ বর্ণিত আছে। বিনয় পিটকে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের প্রতিপাল্য নীতিসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অভিধর্ম পিটকে বৌদ্ধ দর্শন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের প্রায় পাঁচশ বছর পর সিংহল (বর্তমান শ্রীলংকা) রাজা বট্টগামিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীলঙ্কায় চতুর্থ মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এই মহাসঙ্গীতিতেই সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম পিটকের নামে সর্বপ্রথম পালিভাষা লিপিবদ্ধ করা হয়।

ত্রিপিটকের প্রথম পিটক সূত্ত পিটক (সূত্র পিটক)। সূত্র পিটকে গৌতম বুদ্ধের দেশনা বা উপদেশের কথা আলোচনা করা হয়েছে। গৃহি জীবনের নৈতিক উপদেশের কথা শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা এখানে আলোচনা করা হয়েছে। বুদ্ধকালীন সময় ভারতের ভৌগোলিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থায় সুবিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সুত্ত পিটকে দান, ধ্যান, বিমোক্ষ, অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা, চিত্ত, চৈতসিক, নির্বাণের কথা আলেচনা করা হয়েছে। বিনয় পিটকে নিয়ম-কানুন, আচার-আচরণ, শাসন-অনুশাসন, অপরাধ-দণ্ডবিধি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অভিধর্মার্থ সংগ্রহের লেখক শ্রী বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি সূত্র সম্পর্কে বলেন[৭] 'সূত্রের ভাষা ব্যবহারিক 'বোহার বচন'–সত্ত্ব, জীব, জন্ম, মৃত্যু, দেব, ব্রহ্ম, তুমি, আমি ইত্যাদি। সুত্রের ভাষা আছে, সে ভাষায় তরঙ্গ আছে, উচ্ছ্বাস আছে, উদান আছে, গাথা আছে, উদ্দীপনা আছে, অপায় আছে, অপায় ভয় আছে, দেব-ব্রহ্মলোকের আকর্ষণ আছে, নির্বাণের সুসমাচার আছে।' 'বিনয়'[৮] শব্দের অর্থ 'নিয়মানুবর্তিতা, নীতি, নিয়ম, শৃঙ্খলা বা বিধি-বিধান, নৈতিক এবং মানসিক শিক্ষা'। 'অভিধর্ম' শব্দের অর্থ দর্শন বা দার্শনিক তথ্য বিশ্লেষণ। অভিধর্ম পিটকে বুদ্ধের দর্শন বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুত্ত পিটকে পাঁচ নিকায়ে বিভক্ত করা হয়েছে–১. দীঘ নিকায়, ২. মজ্ঝিম নিকায়, ৩. সংযুক্ত নিকায়, ৪. অঙ্গুত্তর নিকায় ও ৫. খুদ্দক নিকায়। বিনয় পিটকের পাঁচটি গ্রন্থ। এই পাঁচটি গ্রন্থকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় যথা : (ক) সূত্র বিভঙ্গ–১. পারাজিকা, ২. পাচিত্তিয়া। (খ) খন্ধক–১. মহাবর্গ, ২. চুল্লবর্গ ও (গ) পরিবার পাঠ। অভিধর্ম পিটক সাতটি গ্রন্থের সমন্বয়ে এই পিটক। ত্রিপিটকে অভিধর্ম পিটকের সাতটি গ্রন্থকে সপ্তপ্রকরণ, সত্তপ্রকার বলা হয়। বুদ্ধদত্তের মতে[৯], অভিধর্ম পিটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় চারটি : চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ। অভিধর্ম পিটক সাতটি ভাগে বিভক্ত–(ক) ধম্মসঙ্গনি, (খ) বিভঙ্গ, (গ) ধাতুকথা, (ঘ) পুগ্গলপঞ্ঞত্তি, (ঙ) কথাবত্থু, (চ) যমক, (ছ) পট্ঠান।

১. **দীঘ নিকায় :** দীঘ নিকায় সুত্রপিটকের প্রথম গ্রন্থ। বুদ্ধের উপদেশ বাণীগুলো এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এই নিকায়ে দান, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, ধ্যান, বিমোক্ষ, অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা, চিত্ত, চৈতসিক ও নির্বাণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দীঘু নিকায় ৩৪টি সূত্রের কথা উল্লেখ করা আছে। এই ৩৪টি সূত্রকে ৩টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। শীলখন্ধ মহাবর্গ ১০ সুত্র আর পিটক বর্গে ১১ সূত্র রয়েছে।

২. **মধ্যম নিকায় :** সূত্রপিটকে দ্বিতীয় গ্রন্থ মধ্যম নিকায়। প্রত্যেকটি সূত্র ক্ষুদ্রতর হলেও আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে, ত্রিপিটকের মধ্যে মজ্ঝিম নিকায় সর্বোত্তম গ্রন্থ। অধ্যাপক ড. বেণী মাধব বড়ুয়ার মতে[১০] বুদ্ধের জীবন ও বাণীর যথার্থ মর্ম সম্যক উপলব্ধি করতে হলে মজ্ঝিম নিকায়ই একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ। অপর কোনো গ্রন্থে বুদ্ধের হৃদয় এত স্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হয়নি। এ গ্রন্থ চতুরার্যসত্য, আর্যঅষ্টাগিক মার্গ, প্রতিত্যসমুৎপাদ, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা, পঞ্চস্কন্ধ, পঞ্চনিবারণ, ভিক্ষুদের

জীবনযাত্রা, গৃহীদের তৎকালীন ভারতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও ধর্মীয় বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এ নিকায়ে ১৫২টি সূত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়।

৩. **সংযুক্ত নিকায় :** সংযুক্ত নিকায়ে সূত্রপিটকে তৃতীয় খণ্ড। 'সংযুক্ত নিকায়' অর্থ সাদৃশ বা সমগোত্রীয় বা সমনিকায়। এ নিকায় বুদ্ধের সাথে দেবতা ও ব্রাহ্মণদের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে এ নিকায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। সংযুক্ত নিকায়ে[১১] ২৮৮৯টি সূত্ররের উল্লেখ পাওয়া যায়, গুচ্ছ অনুসারে ৫৬টি সংযুক্ত, এই সংযুক্তগুলিকে ৫টি বর্গে বিভক্ত করা হয়েছে। ১. নিদানবর্গ (১০টি সংযুক্ত আছে), ২. খন্দবর্গ (১৩টি সংযুক্ত আছে), ৩. সগাথা বর্গ (১১টি সংযুক্ত), ৪. সলায়তন বর্গ (১০টি সংযুক্ত আছে), ৫. মহাবর্গ ৯১২টি সংযুক্ত আছে।

৪. **অঙ্গুত্তর নিকায় :** অঙ্গুত্তর নিকায় সুত্ত পিটকের চতুর্থ গ্রন্থ। মিলিন্দ প্রশ্নে[১২] এ পিটকে একোত্তরনিকায় নামে অভিহিত করা হয়েছে। এতে ২৩০৮টি সূত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। অঙ্গুত্তর নিকায় ১১টি নিপাতে ভাগ করা হয়েছে। একনিপাত[১৩] 'নিপাত' বলতে বিভাগ বা অধ্যায়কে বোঝানো হয়েছে তখনকার সময়ে ভিক্ষুদের বিভিন্ন সময় যা উপদেশ দিতে তা সংগৃহীত করা হয়েছে। এ নিপাত ২০টি বর্গে বিভক্ত করা হয়।

৫. **খুদ্দক নিকায় :** খুদ্দক নিকায় বা ক্ষুদ্রনিকায় সূত্রপিটকের পঞ্চম গ্রন্থ বা শেষ গ্রন্থ। নিকায় আকারে দেওয়া হলেও বিশালতা অনেক বড়। এ নিকায় সম্পূর্ণ নিজস্বতা পরিলক্ষিত হয়। এ নিকায় কিছু গ্রন্থ ছোট আবার কিছু গ্রন্থ অনেক বড়। এতে পালি সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাসের নিদর্শন জানা যাবে। বিভিন্ন দেশে আলোকে খুদ্দক নিকায় বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছে। যেমন, শ্রীলংঙ্কা ঐতিহ্য অনুসারে[১৪] এ নিকায় ১৫টি গ্রন্থ। যেমন–(১) খুদ্দক পাঠ, (২) ধম্মপদ, (৩) উদান, (৪) ইতিবুত্তক, (৫) সুত্ত নিপাত, (৬) বিমান বত্থু, (৭) পেত বত্থু, (৮) থেরগাথা, (৯) থেরীগথা, (১০) জাতক, (১১) নিদ্দেস, (১২) পটিসম্ভিদা মগ্গ, (১৩) অপদান, (১৪) বুদ্ধ বংশ ও (১৫) চরিয়াপিটক।

বার্মা ঐতিহ্য অনুসারে[১৫] ৪টি। যেমন–১. মিলিন্দ প্রশ্ন, ২. সুত্র সংগ্রহ, ৩. পেটকোপদেশ এবং ৪. নেত্তিপ্পকরণ। থাইল্যান্ডের ঐতিহ্য অনুসারে[১৬] ৭টি। যেমন–(১) খুদ্দক পাঠ, (২) ধম্মপদ, (৩) উদান, (৪) ইতিবুত্তক, (৫) সুত্ত নিপাত, (৬) নির্দেশ ও (৭) পটিসম্ভিদামগ্গ।

২। **বিনয় পিটক :** বিনয় পিটক পালি সাহিত্যে ত্রিপিটকের দ্বিতীয় পিটক হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। কোনো কোনো পণ্ডিত এটিকে প্রথম পিটক হিসেবে ধারণা করেন। 'বিনয়'[১৭] শব্দের অর্থ পরিচালনা, নম্র, ভদ্র, আচার-আচরণ, নিয়ম-কানুন, নিয়ম বা নীতি-শৃঙ্খলা, শাসন-অনুশাসন। 'বিনয়' শব্দটি পারিভাষীয়। ইহার অর্থ নিয়মানুবতিতা, নৈতিক এবং মানসিক শিক্ষা। ইংরেজিতে এটিকে discipline বলা হয়। বৌদ্ধধর্ম ইতিহাসে বিনয় পিটকের গুরুত্ব অনেক বেশি। ভিক্ষু জীবন ও বৌদ্ধ সঙ্ঘের নিয়মাবলি ছাড়াও

বিনয় পিটক প্রাচীন ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা-ব্যবস্থা, চিকিৎসা পদ্ধতি ও প্রযুক্তি বিদ্যার উপর আলোকপাত করে।[১৮] বিনয় বুদ্ধ শাসনের আয়ু স্বরূপ। "বিনয়নাম বুদ্ধসাসনস্স আয়ু, বিনয়ং ঠিতো বুদ্ধ সাসন ঠিতং হোতি।"[১৯] বিনয় ব্যতীত বুদ্ধ শাসনের স্থিতি অকল্পনীয়। বিনয় পিটকের পাঁচটি গ্রন্থ। এই পাঁচটি গ্রন্থকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়[২০] (ক) সূত্র বিভঙ্গ–(১) পারাজিকা, (২) পাচিত্তিয়া। (খ) খন্ধক–(১) মহাবর্গ, (২) চুল্লবর্গ ও (গ) পরিবার পাঠ।

(ক) সূত্র বিভঙ্গ : সূত্র বিভঙ্গ বিনয় পিটকের প্রথম এবং অন্যতম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ভিক্ষু এবং ভিক্ষুনীদের দৈনন্দিন আচার-আচরণ, জীবনযাত্রার রীতিনীতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[২১] এই গ্রন্থটি বিনয় পিটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসেবে মনে করা হয়। 'সুত্তবিভঙ্গ[২২] যৌগিক শব্দের মধ্যে 'সুত্ত' শব্দ বিভিন্ন অর্থের দ্যোতক, যথা-রজ্জু, ধর্মোপদেশ, নিয়ম বা বিধি ইত্যাদি। সূত্র বিভঙ্গের 'সুত্র' শব্দে অর্থ ভিক্ষুদের আচার-আচরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আর বিভঙ্গ শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা, ভেঙ্গে-চুরে বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করা। ত্রিপিটকের বহু গ্রন্থে 'পাতিমোক্খ' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। পাতিমোক্খ বা 'পাটিমোক্খ'শব্দের নানা অর্থ পালিতে করা হয়েছে।[২৩] বিনয় মহাবগ্গে (২য়) 'পাতিমোক্খ' সম্পর্কে বলা হয়েছে, পাতিমোক্খং তি 'আদিমেতং মুখমেতং পমুখমেতং কুসলানং ধম্মানং অর্থাৎ প্রাতিমোক্ষ কুশল ধর্মসমূহের আদি (প্রথম) মুখ (দ্বার) প্রমুখ (পুরোভাগ)[২৪] ইত্যাদি। 'বিসুদ্ধিমগ্গ ইহার অর্থ করা হয়েছে, যো নং পাতি রক্খতি তং মোক্খেতি তং মোচয়তি আপায়িকাদীহি দুকখেতি; তস্মা পাতিমোকখন্ তি বুচ্চতি।[২৫] অর্থাৎ, যে তাকে পালন করে ও রক্ষা করে, তা তাকে মুক্ত করে অপররের দুঃখ মোচন করে তাকেই পাতিমোক্ষ বলে। Rhys Davids, Childers, Franke প্রভৃতি আধুনিক পণ্ডিতগণও শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করবার প্রয়াস পেয়েছে[২৬]। বৌদ্ধ সংস্কৃতে পাতিমোকখের প্রতিশব্দরূপে প্রাতিমোক্ষ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ইহার অর্থ পাপ হতে মুক্তি। পাতিমোক্খ শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত, এক মুক্তি অর্থে দ্বিতীয় মুখ, প্রমুখ বা প্রধান অর্থে। সুত্র বিভঙ্গ মুলত প্রাতিমোক্ষ বিষয়ে বিস্তারিত নিয়ম নীতিগুলো আলোচনা করা। প্রাতিমোক্ষ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের বিভিন্ন দোষত্রুটি দণ্ডবিধান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাতিমোক্ষ অনুসারে ভিক্ষুদের ২২৭টি শীল আর ভিক্ষুণীদের ৩১১টি শীল। ভিক্ষুদের সুত্রবিভঙ্গকে[২৭] 'মহাবিভঙ্গ' বা ভিক্ষু বিভঙ্গ এবং ভিক্ষুনী বিভঙ্গ নামে আখ্যায়িত। সূত্র ভিবঙ্গকে[২৮] দুই ভাগে বিভক্ত- পারাজিকা এবং পাচিত্তিয়া। যেমন–(ক) পারাজিকা (অপরাধ)-৪, (খ) সংঘদিসেস (অপরাধ)-১৩, (গ) অনিয়ত (অপরাধ)-২, (ঘ) নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়া (অপরাধ)-৩০, (ঙ) শুদ্ধ পাচিত্তিয় (অপরাধ)-৯২, (চ) পটিদেসনীয় (অপরাধ)-৪, (ছ) সেখিয়া-৭৫, (জ) অধিকরণ সমথ (বিবাদ) মীমংসা-৭।

১. **পারাজিকা :** বিনয় পিটকের প্রথম গ্রন্থ এটি ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। 'পারাজিক'[২৯] শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পরাজয় প্রাপ্ত অর্থাৎ সংঘ কোনো একটি অপরাধ করলে তখন পারাজিকা প্রাপ্ত হয়ে সংঘ অধিকার থাকে না। পারাজিকা (অপরাধ)-৪টি। প্রথম পারাজিকায় যদি কোনো ভিক্ষু স্ত্রী বা পুরুষ যে কোনোভাবে স্বেচ্ছায় মৈথন সেবনে লিপ্ত থাকে। দ্বিতীয় পারাজিকায়, যদি কোনো ভিক্ষু অদত্ত কোনো দ্রব্য গ্রহণ করা থেকে লিপ্ত থাকে। তৃতীয় পারাজিকায়, যদি কোনো ভিক্ষু প্রাণী হত্যার সাথে লিপ্ত থাকে। সর্বশেষে চতুর্থ পারাজিকায়, যদি কোনো কোনো ভিক্ষু ধ্যান সমাধি দ্বারা লোকোত্তর মার্গফলাদি লাভ না করেও লাভ করেছে বলে প্রচারে লিপ্ত থাকে।

২. **পাচিত্তিয়া :** বিনয় পিটকের দ্বিতীয় গ্রন্থ পাচিত্তিয়া। পাচিত্তিয়া ৪ প্রকার। পাচিত্তিয়া[৩০] শব্দের অর্থ প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ, দোষ শিকার করা। পাচিত্তিয়া হচ্ছে ৯২টি। এই পাচিত্তিয়াকে[৩১] ৯টি বর্গে ভাগ করা হয়েছে। ১. মুসাবাদ ২. ভূতগাম ৩. ভিকখুনোবাদ ৪. ভোজন ৫. অচেলক ৬. সুরাপান ৭. সপ্পানক ৮. সহধম্মিক ও ৯. রাজবর্গ। এটি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের অপরাধ করলে সংঘের সামনে অপরাধ শিকার করলে দোষ মুক্ত হয়ে যায়। এটিকে শুদ্ধ পাচিত্তিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বর্গ অনুসারে প্রথম সপ্তম বর্গ পর্যন্ত দশটি করে নিয়ম বা বিধি। অষ্টম বর্গে ১২টি নিয়ম বা বিধি আছে আর নবম বর্গে দশটি বিধি আছে।[৩২]

খ. খন্ধক : বিনয় পিটকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পিটক খন্ধক। খন্ধক পিটকে বিভিন্ন অধ্যায় বা পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয় বলে ইহার নাম খন্ধক। খন্ধক পিটকে ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদের দৈনদিন জীবনযাপন, সংঘের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, সংঘের কর্মকান্ড, সংঘের বর্ষাবাসের নিয়মাবলি ভৈষজ্যের ব্যবহার, বিভিন্ন অপরাধে শাস্তি বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এই খন্ধক[৩৩] পিটকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন : মহাবর্গ এবং চুল্লবর্গ।

১. **মহাবর্গ :** মহাবর্গ বিনয় পিটকের অন্যতম গ্রন্থ এবং খন্ধক বিভাগ অনুসারে প্রথম বিভাগ। বুদ্ধের সময়কালে অনেক ঐতিহাসিক কাহিনী এই পিটকে লিপিবদ্ধ করা হয়। এতে বুদ্ধত্ব লাভ হতে সংঘ প্রতিষ্ঠা পযর্ন্ত ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় অনুসারে মহাবর্গ[৩৪] পিটক দশটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১. মহাস্কন্ধ, ২. উপসতস্কন্ধ, ৩. বর্ষোপনায়িকা স্কন্ধ, ৪. প্রবারণা স্কন্ধ, ৫. চর্মস্কন্ধ, ৬. ভৈষজ্য, ৭. কঠিন স্কন্ধ, ৮. চীবর স্কন্ধ, ৯. চম্পেয্য স্কন্ধ, ১০. কোসম্বক স্কন্ধ। কিন্তু ভিক্ষুনীদের[৩৫] ক্ষেত্রে ৩১১টি নিয়ম বা শীল যেমন–(ক) পারাজিকা-৮, (খ) সংঘাদিসেস ১৭, (গ) অনিয়ত ভিক্ষুণী বিভঙ্গে নেই, (ঘ) নিসসগ্গিয় পাচিত্তিয়া ৩০, (ঙ) শুদ্ধ পাচিত্তিয়া ১৬৬, (চ) পটিদেসনীয় ৮, (ছ) সেখিয়া ৭৫, (জ) অধিকরণ সমথ ৭।

২. **চুল্লবর্গ :** বিনয় পিটকের চতুর্থ গ্রন্থ এবং খন্ধকের দ্বিতীয় গ্রন্থ। এটি মহাবর্গের বর্ধিত কলেবর বলা হয়। 'চুল্ল' শব্দের অর্থ ক্ষুল্ল, ক্ষুদ্র বা ছোট [৩৬]। চুল্লবর্গে বুদ্ধের জীবন কাহিনী, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের নিয়ম কানুন, আচার আচরণ, অপরাধী ভিক্ষুদের শাস্তি বিধান বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো প্রত্যেক ব্যক্তিকে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা সাধনার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের করে মুক্তি লাভ করা। এতে অধ্যায়ের সংখ্যা ১২টি। যেমন-১. কর্ম স্কন্ধ, ২. পরিবাস, ৩. সমুচ্চয় স্কন্ধ, ৪. সমথ স্কন্ধ, ৫. ক্ষুদ্রবস্তু স্কন্ধ, ৬. সেনাসন স্কন্ধ, ৭. সংঘভেদক স্কন্ধ, ৮. ব্রত স্কন্ধ, ৯. প্রাতিমোক্ষপাঠ স্কন্ধ, ১০. ভিক্ষুণী স্কন্ধ, ১১. পঞ্চশতী স্কন্ধ, ১২. সপ্তশতিকা স্কন্ধ।

৩. **অভিধর্ম পিটক :** অভিধর্ম পিটক ত্রিপিটকের তৃতীয় পিটক। এই পিটক ত্রিপিটকের শেষ পিটক। 'অভি'[৩৭] উপসর্গের সাথে 'ধর্ম' শব্দটি যোগ করে অভিধর্ম শব্দটি গঠন করা হয়। অভি শব্দটির অর্থ অধিক, অনেক, বেশি, অতিরিক্ত। আর ধর্ম শব্দের অর্থ হলো বিশ্বাস, চিন্তনীয়, আস্থা ও ধর্মতা। সুতরাং অভিধর্মকে[৩৮] অতিরিক্ত বা অধিকরতর আখ্যায়িত করা হয়। আচার্য বুদ্ধঘোষ অভিধর্মের অর্থ করেছেন, 'ধম্মাতিরেকধম্মসিসত্থেন অভিধম্মো' অর্থাৎ ধর্মের অতিরিক্তই অভিধর্ম। ইহার সাথে (Metaphysics) বা অধিবিদ্যার কোনো সম্পর্ক নাই[৩৯]। অভিধর্ম সূত্র ও বিনয়ের তাত্ত্বিক বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা অর্থে ব্যবহার করা হয়। এ গ্রন্থ ধর্মের দর্শনের বিশদ ও বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অভিধর্ম পিটকের গ্রন্থসমূহ সম্রাট অশোকের পরবর্তীকালীন বিকাশ বলে মনে করা হয়।[৪০] সূত্র হচ্ছে উপদেশ, বিনয় হচ্ছে আইনকানুন আর অভিধর্ম হচ্ছে বুদ্ধের দর্শন বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বুদ্ধ তাবতিংস স্বর্গে গিয়ে মাতাকে অভিধর্ম দেশনার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং তুষিত স্বর্গে পিতাকে অভিধর্ম দেশনার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। অভিধর্ম পিটক সূত্র পিটকের পরিপূরক বলা যায়। বৌদ্ধ ঐতিহ্যে সূত্রকেই অভিধর্মের ভিত্তি বলা হয়[৪১]। অভিধর্ম পিটক সাতটি গ্রন্থটি সমন্বয়ে এই পিটক। এছাড়াও অভিধর্ম পিটকের এ সাতটি গ্রন্থকে সপ্তপ্রকরণ, সত্তপ্রকার বলা হয়।[৪২] যেমন : (১) ধর্মসঙ্গনি, (২) বিভঙ্গ, (৩) ধাতুকথা, (৪) পুগ্গলপঞ্ঞত্তি, (৫) কথাবত্থু, (৬) যমক, এবং (৭) পট্ঠান।

ক) ধর্মসঙ্গনি : অভিধর্ম পিটকের প্রথম গ্রন্থ ধর্মসঙ্গনি। এটি অভিধর্ম পিটকের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পিটক। এর অর্থ 'ধর্ম-সংগণনা অথবা সংক্ষিপ্ত দেশনা।[৪৩] এতে বৌদ্ধধর্মের কামাবচর, রূপাবচর, মানসিক অবস্থাগুলো আলোচনা করা হয়। এতে চিত্ত, চৈতসিক ও

রূপ বা দৃশ্যবস্তু সম্পর্কে কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত এ তিন ভাগে ভাগ করা হয়[৪৪]। (১) চিত্ত, চৈতসিক, (২) রূপ এবং (৩) নিক্ষেপ বা সংক্ষিপ্তসার।

খ) **বিভঙ্গ :** অভিধর্ম পিটকের দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম বিভঙ্গ। বিভঙ্গ শব্দের অর্থ ধর্মে মূল বিষয়গুলোকে ভেঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে বিস্তারিত ভাগে ব্যাখ্যা করা। বিভঙ্গের[৪৫] ধারা বলা যায় সংশ্লেষণমূলক যা ইংরেজিতে Synthetical। বিভঙ্গকে ১৮টি ভাগে ভাগ করা হয়[৪৬]। ১. খন্ধ বিভঙ্গ ২. ধাতু বিভঙ্গ ৩. সচ্চ বিভঙ্গ ৪. ইন্দ্রিয় বিভঙ্গ ৫. পচ্চাযাকার বিভঙ্গ ৬. সতিপট্ঠান বিভঙ্গ ৭. সম্পাপ্পধান বিভঙ্গ ৮. ইদ্ধিপাদ বিভঙ্গ ৯. বোজঝ্ঙ্গ বিভঙ্গ ১০. মগ্গ বিভঙ্গ ১১. ঝান্ বিভঙ্গ ১২. অপ্পমঞ্ঞ বিভঙ্গ ১৩. সিক্খাপদ বিভঙ্গ ১৪. পটিসম্ভিদা বিভঙ্গ ১৫. ঞান বিভঙ্গ ১৬. খুদ্দকবত্থু বিভঙ্গ।

গ) **ধাতু কথা :** অভিধর্ম পিটকের তৃতীয় গ্রন্থের নাম ধাতুকথা। ইহা অভিধর্ম পিটকের ক্ষুদ্র একটি গ্রন্থ, যা প্রশ্নাকারে সঠিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ধাতুকথাকে তিনটি পরিচ্ছেদ অনুসারে ভাগ করা হয়। খন্ধ বিভঙ্গ, আয়তন ও ধাতু বিভঙ্গ।[৪৭] ইহার মূল চিত্ত বুদ্ধের ধাতু সম্পর্কে বর্ণনা উল্লেখ পাওয়া যায়। যারা বিদর্শন ভাবনা বা ধ্যানী ভিক্ষু মানসিক অভিবৃক্তি বা চিত্ত চৈতসিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। পঞ্চস্কন্ধ[৪৮]- রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। দ্বাদশ আয়তন[৪৯]- চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম। আঠারো প্রকার ধাতু[৫০]- চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, ধর্ম, চক্ষু বিজ্ঞান, শ্রোত্র বিজ্ঞান, ঘ্রাণ বিজ্ঞান, জিহ্বা বিজ্ঞান, কায় বিজ্ঞান ও মন বিজ্ঞান।

ঘ) **পুগ্গলপঞ্ঞত্তি :** অভিধর্ম পিটকের চতুর্থ গ্রন্থের নাম পুগ্গলপঞ্ঞতি। এখানে 'পুগগল'[৫১] পালি শব্দ, বাংলায় পুদগল, যা ব্যক্তি, পুরুষ, সত্তা বা আত্মা অর্থে বোঝানো হয়েছে। 'পঞ্ঞত্তি'[৫২] পালি বাংলায় প্রজ্ঞপ্তি যার অর্থ প্রজ্ঞাপন জারি করা, প্রকাশ করা বা যথার্থ বলে নির্দেশ করা। পুদগলকে[৫৩] আরো বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যার অর্থ পৃথকজন, শৈক্য, অশৈক্ষ্য, আর্য, অনায, স্রোতাপত্তী, সকৃদাগামী, অনাগামী, অরহৎ, প্রত্যেকবুদ্ধ, সম্যকসবুদ্ধ বোঝায়। স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, সত্য, ইন্দ্রিয় এবং পুদ্গল এই ছয় প্রকার প্রজ্ঞপ্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও একবিধ পুদ্গল, দ্বিবিধপুদ্গল, এভাবে দশ প্রকার পুদগলের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এই অভিসন্ধর্ভে পঞ্চাশ প্রকার পুদ্গালের উল্লেখ করছি, যথা[৫৪] ১. কালবিমুক্ত, ২. অকাল বিমুক্ত, ৩. কুপ্যধর্মী,

৪. অকুপ্যধর্মী, ৫. পরিহানীয়ধর্মী, ৬. অপরিহানীয় ধর্মী, ৭. চেতনাভব্য, ৮. অনুরক্ষণভব্য, ৯. পৃথকজন, ১০. গোত্রভু, ১১. ভয়াবরুদ্ধ, ১২. অকুতোভয়, ১৩. উন্নত জীবনলাভে অক্ষম, ১৪. উন্নত জীবনলাভে সক্ষম, ১৫. নিয়ত, ১৬. অনিয়ত, ১৭. প্রতিপন্ন, ১৮. ফলস্থিত, ১৯. সমশীর্ষক, ২০. স্থিতকল্প, ২১. আর্য, ২২. অনার্য, ২৩. শৈক্ষ্য, ২৪. অশৈক্ষ্য, ২৫. শৈক্ষ্যও নহে অশৈক্ষ্যও নহেন, ২৬. ত্রিবিদ্যা, ২৭. ষড়ভিজ্ঞ, ২৮. সম্যক সম্বুদ্ধ, ২৯. প্রত্যেকবুদ্ধ, ৩০. উভয়ভাগ বিমুক্ত, ৩১. প্রজ্ঞা বিমুক্ত, ৩২. কায়দর্শী, ৩৩. দৃষ্টিপ্রাপ্ত, ৩৪. শ্রদ্ধাবিমুক্ত, ৩৫. ধর্মানুসারী, ৩৬. শ্রদ্ধানুসারী, ৩৭. সপ্তজন্ম পরিগ্রাহক, ৩৮. কুল কুলান্তর পরিগ্রহক, ৩৯. একবীজী, ৪০. সকৃদাগামী, ৪১. অনাগামী, ৪২. অন্তরাপরিনির্বায়ী (মধ্যবর্তী সময়ে নির্বাণ প্রাপ্ত), ৪৩. উপহত্য নির্বায়ী (আয়ক্ষয়ে নির্বাণপ্রাপ্ত), ৪৪. অসংস্কার পরিনির্বায়ী, ৪৫. সসংস্কার পরিনির্বায়ী, ৪৬. উর্ধ্বস্রোত অকনিষ্ঠগামী, ৪৭. স্রোতাপন্ন, ৪৮. সকৃদাগামী ফল লাভার্থে সচেষ্ট, ৪৯. অনাগামী ফল লাভে সচেষ্ট, ৫০. অর্হৎ।

সূত্র পিটকের সাথে অভিধর্ম পিটকের মিল পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে ব্যক্তির ধারণা ও বিকাশের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাদের স্বভাব চরিত্রের বৈচিত্র্য কথা উল্লেখ করা হয়। অন্যান্য গ্রন্থের চেয়ে এ গ্রন্থে ভিন্নতা পরিচয়।

ঙ) **কথাবত্থু :** কথাবত্থু অভিধর্ম পিটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এটি অভিধর্মে পঞ্চম গ্রন্থ যার গুরুত্ব অনধিক মূল্যবানও। বুদ্ধঘোষ খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কথাবত্থু টীকাগ্রন্থ রচনা করেন।[৫৫] ত্রিপিটকে কেবল কথাবত্থুর সঠিক তথ্য বা নাম পাওয়া যায়। মোগ্গলিপুত্র তিষ্যস্থবির বিভজ্জবাদ বা থেরবাদের মতাদর্শ কথাবত্থুর রচয়িতা এই কথাবত্থুটি তৃতীয় সংগীতিতে সম্রাট অশোক পৃষ্ঠপোষকতায় সংকলন করা হয়। এই গ্রন্থে বুদ্ধের বিভাজ্যবাদ নীতিই প্রতিষ্ঠা প্রদানে জোর দিয়েছেন। এই সংগীতির আয়োজনের প্রধান উদ্দেশ্যে থেরবাদ সম্প্রদায়কে বিশুদ্ধভাবে জীবনযাপন করা এবং লাভ সৎকারলাভী বিভিন্ন মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন শ্বেতবস্ত্রধারী ভিক্ষুদের বিতাড়িত করা। অভিধর্ম পিটকের কথাবত্থু একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। কথাবত্থুতে তথাগত বুদ্ধের ত্রিপিটকের প্রাচীনত্বে বিভিন্ন দিক ফুটে ওঠেছে। সামন্তপাসাদিক ও সিংহলী ইতিহাস কাব্য মহাবংস অনুসারে অশোকের সময় বৌদ্ধসংঘ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। বুদ্ধঘোষ কথাবত্থুতে উল্লিখিত ও খণ্ডিত মতবাদগুলো কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মতবাদ, তা

উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থের মধ্যে সর্বাস্তিবাদ, মহাসাংঘিক, সন্মিতিয়, শৈল, বেতুল্যক, সংক্রান্তেক, হৈমবত, উত্তরাপথক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উইনটারনিজের মতে, গ্রন্থে কিছু অংশ শোকের সময়ে রচিত হইয়েছিল।[৫৬] এবং অবশিষ্ট অংশ পরবর্তীকালে কোনো সময়ে রচিত হইয়েছে। তবে যে অংশে বৈতুল্যক, হৈমবত, শৈল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে সেই অংশ অশোকের অনেক পরে রচিত হইয়েছে। সুতরাং সম্পূর্ণ কথাবত্থু যে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত হয়নি তা নিশ্চিত। স্বর্গীয় বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি বলেছেন, এ গ্রন্থে সর্বাস্তিবাদ ১৪১ কথাবত্থু গ্রন্থটি সাথে মিলিন্দ প্রশ্নের গ্রন্থে তুলনা করা যায়। বিভিন্ন গুরুতাত্ত্বিক প্রশ্নের জটিল সমাধান এখানে উল্লেখ করা হয়, যা কথাবত্থু বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাস প্রজ্ঞা পরিচয়। দর্শনের আলোচনার উল্লেখ পাওয়া যায় বিভিন্ন ১৪১ কথাবত্থু ২৩টি পরিচ্ছদে পরিচিত।

চ) **যমক :** যমক বর্গ অভিধর্ম পিটকের ষষ্ঠ গ্রন্থ। যমক শব্দ অর্থাৎ জোড়া, যুগ্ম বা জোড়া।[৫৭] এই গ্রন্থে প্রত্যেক্ষ পরিচ্ছেদে পক্ষ ও বিপক্ষে প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে। অভিধর্ম পিটকের যমক পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। খন্ধ যমক, আয়তন যমক, ধাতু যমক, সচ্চ যমক, সংখ্যার যমক, অনুসঙ্গ যমক, চিত্ত যমক এবং ইন্দ্রিয় যমক। ইহাকে যমক বলা হয় কারণ স্বপক্ষীয় ও প্রতিপক্ষীয় প্রশ্নযুগল ও তদুত্তর দ্বারা উক্ত দশ অধ্যায়ে ব্যবহৃত সমগ্র পারিভাষিক শব্দের অর্থকে বিশদ ও নিশ্চয়ার্থ বোধক করা হইয়েছে যেন তাকে দ্বর্থ বা কল্পিতার্থ বা অন্য কোনো রূপ উদ্দেশ্য বহির্ভূত অর্থ আরোপ করা না যায়। মূলযমকে কুশল, অকুশল, খন্ধযমকে পঞ্চস্কন্ধ, আয়তনযমকে দ্বাদশ, ধাতুযমকে অষ্টাদশ প্রকার ধাতু, সচ্চযমকে চতুরার্যসত্যে, সংখ্যারযমকে কায়সংস্কার, বাকসংস্কার, মনঃসংস্করের, অনুশয়যমকে কামরাগ, পটিঘ, দৃষ্টি, বিচিকিৎকা, মান, ভবরাগ, অবিদ্যা, চিত্তযমকে চিত্ত চৈতসিক বৃত্তি, ধর্মযমকে কুশল, অকুশল ধর্ম ও ইন্দ্রিয়যমকে ২২ প্রকার ইন্দ্রিয়ের ব্যাখ্যার কথা আলোচনা করা হয়।

ছ) **পট্ঠান :** পট্ঠান অভিধর্ম পিটকের সপ্তম গ্রন্থ এবং সর্ববৃহৎ গ্রন্থ। এ গ্রন্থে নামরূপের যাবতীয় সম্পর্ক বা কারণ নির্ণয়ের মূল বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক দৃষ্টিতে উদয় বিলয়ের

কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পটঠান শব্দের অর্থ প্রধান কারণ বা প্রকৃত কারণ।[৫৮] পটঠানকে মহাপ্রকরণ নামেও উল্লেখ করা হয়। বুদ্ধঘোষ পচ্চয়ের সংজ্ঞা দিয়াছেন 'যং পটিচ্চ ফলং এতি সো পচ্চয়ো অপ্পচ্চক খায় নং বত্ততীতি অত্থো।'[৫৯] এটি বৌদ্ধ দর্শনের কার্যকারণ নীতি হিসেবে খ্যাত।

প্রতিত্যসমুপাদ নীতি ও পটঠান নীতি এই দুটি ধারা পটঠান পর্যালোচনা করা হয়েছে। ইহা একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ। এটি মানুষের নামরূপের যাবতীয় জাগতিক বস্তুর কার্য কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করাই প্রতিপাদ্য বিষয়। 'পচ্চয়' শব্দের অর্থ কারণ, নিদান, হেতু, সম্ভব, প্রভাব, ইত্যাদি।[৬০] পট্ঠানে ২৪ প্রকার প্রত্যয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য এক অনন্য রত্নভাণ্ডার হিসেবে সমাদৃত। পালি সাহিত্য প্রচার প্রসারে যেমন ইতিহাসসমৃদ্ধ তেমনি সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের উৎপত্তিও কোনো অংশে কম নয়। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের কয়েকশ বছর পর সংস্কৃত ও মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছে বলেই বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য বলা হয়ে থাকে। ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া বলেছেন : পালি ভাষা ছাড়া সংস্কৃত ও আধা সংস্কৃত ভাষায় যে সকল বৌদ্ধ গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেইগুলোই সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধ সাহিত্য।[৬১] বৌদ্ধধর্ম, দর্শন, ও সাহিত্যের ইতিহাসে উভয় বৌদ্ধ সাহিত্য অবদানে খুবই প্রসিদ্ধ ও বিস্তৃত। দ্বিতীয় সঙ্গীতির মূলত সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়। ভারত, শ্রীলংকা, বার্মা, থ্যাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া প্রভৃতি যে পালি সাহিত্য প্রভাব দেখা যায় তা একমাত্র থেরবাদ বা বিভাজ্যবাদ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অবদান। পরবর্তী সময়ে দ্বিতীয় সঙ্গীতির পর মূল থেরবাদী ভিক্ষু থেকে দশটি নিয়ম বা দশবত্থুনী নিয়ে ভুল বুঝাবুঝিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আর একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। তাদের নিজস্ব মতাদর্শে চলার চেষ্টা করেন। সে সময়ে যে শাস্ত্র লিখিত হয়েছিল সেটি প্রাকৃত, মিশ্রসংস্কৃত ও সংস্কৃত ভাষায়। বিনীতদেবের মতে, ইহাদের মধ্যে সর্বাস্তিবাদী ও মূল সর্বাস্তিবাদীদের ভাষা ছিল সংস্কৃত ও মিশ্রসংস্কৃত, মহাসাংঘিকদের প্রাকৃত, সম্মিতিয়দের অপ্রভ্রংশ ও থেরবাদীদের পৈশাচী। এই সাহিত্যে যে পুঁথি বা পুঁথির খণ্ডিতাংশ পাওয়া গেছে তাতে অনেক বড় গ্রন্থও আছে"। বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের আকার অনেক সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত। এটি দুটি ধারায় বৌদ্ধ সাহিত্য রচনার মূল প্রতিপাদ্য। একটি থেরবাদী দার্শনিক ধারা এবং মহাযানী দার্শনিক ধারা। মণীন্দ্রনাথ সমাজদার বলেছেন,– বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ পালি সংস্কৃত উভয় ভাষাই রচিত হয়েছে। কোনো কোনো গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়ে পরে পালিতে অনূদিত হয়। পক্ষান্তরে পালিতে রচিত, পরে সংস্কৃতায়িতও হয়েছে।[৬২] বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে মহাযান বৌদ্ধ দর্শনতাত্ত্বিক ধারায় প্রবহমান। Prof. Sylvian Levi এর মতে, সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের গ্রন্থিত ধারার অগ্রযাত্রা শুরু হয় খ্রিস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকের মধ্যে। কিন্তু এর সূচনা হয় দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির পর হতে। অর্থাৎ, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতকের মধ্যে। বিশেষ করে মহাযান বৌদ্ধ দর্শনের বিকাশের সাথে সাথে বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যও বিশেষভাবে প্রসার লাভ করে।[৬৩] সংস্কৃতভাষা উপমহাদেশ তথা বিশ্বের প্রাচীন ভাষা; যাকে ভারতীয় আর্যভাষা বলা হয়ে থাকে।

বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য

বৌদ্ধধর্মের পবিত্র গ্রন্থ ত্রিপিটক। সাহিত্য ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ইহার ব্যাপকতা অনেক বিস্তৃত। ত্রিপিটকে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন ইতিহাসকে দুটি ধারাই আলোচনা করা হয়েছে। একটি পালি বৌদ্ধ সাহিত্য অপরটি সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য। এছাড়াও ত্রিপিটকবর্হিভূত বৌদ্ধ সাহিত্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। ত্রিপিটকে সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম পিটকে যে সমস্ত ইতিহাস সংস্কৃত ভাষায় এবং যে সব গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে; সেটাই সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য হিসেবে পরিচিত। নিম্নে বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের পণ্ডিত ও গ্রন্থের তালিকা[৬৪] দেওয়া হলো :

বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের পণ্ডিত ও সাহিত্য পরিক্রমা

বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের গ্রন্থ তালিকা	
১. সদ্ধর্ম পুণ্ডরিক	১৬. মহাবস্তু
২. মহাযান সূত্র	১৭. দিব্যাবাদন
৩. লংকাবতার সূত্র	১৮. অবদানশতক
৪. ললিতবিস্তর	১৯. অবদানকল্পলতা
৫. প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র	২০. কর্মশতক
৬. সমাধিরাজা সূত্র	২১. অশোকাবদান
৭. সুবর্ণপ্রভাস সূত্র	২২. রত্নাবদানশালা
৮. কারণ্ডব্যুহ সূত্র	২৩. ব্রতাবদানমালা
৯. দশভূমিকা সূত্র	২৪. সুবর্ণ বর্ণাবদান
১০. রত্নকূট	২৫. অবদান সারা সমুচ্চয়
১১. সুখাবতীব্যুহ	২৬. অবতংসক সূত্র
১২. গণ্ডব্যুহ	২৭. পরিপৃচ্ছা সূত্র
১৩. মহাযান বিংশিকা	২৮. রাষ্ট্রপাল পরিপৃচ্ছা
১৪. পদ্যচূড়া মণি	২৯. অক্ষোভ্যব্যুহ ও করুণা পুণ্ডরিক
১৫. বিমলকীর্তি নির্দেশ সূত্র	৩০. মৈত্রীকণাবদান

মহাকবি অশ্বঘোষ - বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ, শারিপুত্র প্রকরণ, বজ্রসূচী, গণ্ডীস্তোত্রগাথা, মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদ, সূত্রালংকার, মহাযান ভূমিগুহ্যবাচামূলাশাস্ত্র, দশটুষ্টকর্মমার্গসূত্র, অষ্টবিঘ্নকথা, দশকুশল কর্মপথ নির্দেশ প্রভৃতি।

বসুবন্ধু - অভিধর্মকোষ, অভিধর্ম কোষ ভাষ্য, পরমার্থ সপ্ততি, গাথসংগ্রহ, বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি, মহাযানসূত্রালংকার, ত্রিস্বভাব নির্দেশ।

নাগার্জুন - মাধ্যমিক কারিকা, মহাযান বিংশত, শূন্যতাসপ্ততি, প্রতীত্যসমুৎপাদ হৃদয় করিকা প্রভৃতি।

আর্যঅসঙ্গ - যোগাচার ভূমিশাস্ত্র, সূত্রালংকার, মহাযান সংগ্রহ, বস্তুসংগ্রহণী, বোধিসত্ত্ব পিটকাবাদ।

শান্তিদেব - বোধিচর্যাবতার, শিক্ষাসমুচ্চয়, সুত্রসমুচ্চয়।

ধর্মকীর্ত - প্রমাণবার্তিকা কারিকা, ন্যায়বিন্দু, প্রমাণ বিনিশ্চয়, সম্বন্ধ পরীক্ষা, সন্তানান্তর সিদ্ধি, ভাষ্যবৃত্তি টীকা, বাদন্যায়, ন্যায়দর্শন, হেতুবন্দি প্রকারণ।

দিঙনাগ - প্রমাণ সমুচ্চয়, ত্রিকাল পরীক্ষা, ন্যায় প্রবেশ আলম্বন পরিক্ষা, হেতুচক্র সমর্থন, ন্যায়মুখ, যোগবিন্দু, যোগসৃষ্টি, সমুচ্চয়, ধর্মবিন্দু।

আর্যদেব - চতুঃশতিকা, চিত্তবিশুদ্ধ প্রকরণ, শতশাস্ত্র বিপুল্য, শতক শাস্ত্র, অক্ষর শতক, মহাপুরুষ শাস্ত্র ও মাধ্যমিক শাস্ত্র (যৌথভাবে গুরু নাগার্জুন)।

ধর্মপাল - আলম্বন প্রত্যায় ধ্যানশাস্ত্রের ব্যাখ্য, শতশাস্ত্র বৈপুল্য ব্যাখ্যা।

শীলভদ্র - আর্য বুদ্ধভূমি এবং সর্ববিদ্যা বিশারদ হিসেবে আরো বহু বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন।

রত্নাকরশান্তি - ছন্দোরত্নাকর, অন্তর্ব্যাপ্তি সমর্থন, হেবজ্রতন্ত্রের ওপর (মুক্তিকাবলি টীকা) সারোত্তমা (৮০০ শ্লোক), শুদ্ধিমতি টীকা, সহজরতি সংযোগ, প্রজ্ঞপারমিতোপদেশ, প্রজ্ঞাপারমিতা ভাবনাপদেশ।

আর্যশূর - জাতকমালা, বোধিসত্ত্ব অবদান মালা, বোধিসত্ত্ব জাতকস্য ধর্মঘণ্টি, সুভাষিত রত্ন করণ্ডক কথা, কর্মফল নির্দেশসূত্র।[৬৫]

অভয়াকর গুপ্ত - বজ্রযানাপত্তি মঞ্জরী, শ্রীমঞ্জুবজ্রাদি-ক্রমাভিষসময়-সমুচ্চয় নিষ্পন্ন, যোগাবলি, বোধিপদ্ধতি।

চন্দ্রগোমি - সিংহনাদ সাধন, হায়গ্রীব সাধন, বোধিসত্ত্ব সম্বর বিংশক, শ্রী জন্তলস্য সংক্ষিপ্ত সাধন।

বিভূতিচন্দ্র - লুহিপাদাভি, সময়বৃত্তি, ষড়ঙ্গযোগ টীকা।

জেতারি - সুগতমত বিভঙ্গ কারিকা।

শ্রীধর - বজ্রচর্চিকা কর্মসাধন।

প্রজ্ঞাভদ্র - শ্রী সহজ সম্বরস্বাধিষ্টান, তত্ত্বচতুরোপদেশ প্রসন্নদীপ, মহামুদ্রপদেশ।

মনোরথ নন্দী - প্রমাণ বার্তিক ভাষ্য।

প্রজ্ঞাবর্মণ - বিশেষ স্তব টীকা, দেবাতিশয় স্তোত্র টীকা।

বোধিভদ্র - রহস্যনন্দ তিলক, সমাধি-সম্ভার-পরিবর্ত, বোধিসত্ত্ব-সম্বর বিধি, জ্ঞানসার সমুচ্চয়, যোগ লক্ষণ সত্য, কালচক্র-গণিত মুখাদেশ।[৬৬]

হরিভদ্র - অষ্টসাহসিকা প্রজ্ঞাপারমিতার উপর অভিসময়ালঙ্কারাবলোক টীকা, স্ফুটার্থ টীকা, সঞ্চয় টীকা, সুবোধিনী, প্রজ্ঞাপারমিতা ভাবনা, পঞ্চবিংশতি সাহস্রিকা, ষড়দর্শন, তত্ত্বসংগ্র, সম্বর বিংশকবৃত্তি, পঞ্চমহোপদেশ।

যশোমিত্র - স্ফুটার্থাভিধর্ম কোষ ব্যাখ্যা।

শান্তরক্ষিত - মধ্যমকালঙ্কার কারিকা, সত্যদ্বয় বিভঙ্গ, পঞ্জিকা, তত্ত্বসংগ্রহ, সম্বরবিংশকবৃত্তি, পঞ্চমহোপদেশ।

হরিবমর্ণ - সত্যসিদ্ধি শাস্ত্র।

দীপকার - অভিধর্ম দীপ।

প্রজ্ঞাকরমতি - পঞ্জিকা।

কত্যায়নীপুত্রদি - জ্ঞানপ্রস্থানাদি শাস্ত্র।

কুমার চন্দ্র - রত্নাবলী, অভিধর্ম সমুচ্চয় ব্যাখ্যা।

বিনীতদেব - ন্যায়বিন্দু টীকা, হেতুবিন্দু টীকা, বাদন্যায় ব্যাখ্যা, সম্বন্ধ পরীক্ষা টীকা, আলম্বন পরীক্ষা এবং সন্তান্তর টীকা।

জিনমিত্র ও জ্ঞানসেন

জিনমিত্র পুত্র - অভিধর্ম সমুচ্চয় ব্যাখ্যা।

বুদ্ধজ্ঞানপাদ - সঞ্চয় গাথা পঞ্জিকা, প্রজ্ঞাপ্রদীপাবলী, মহাযান লক্ষণ সমুচ্চয়।

নাগাবোধি - যমারি সিদ্ধ চক্রসাধন

ইন্দ্রভূতি - সহজসিদ্ধি, সিদ্ধ বজ্রযোগিনী সাধন, জ্ঞানসিদ্ধি, মহামায়া সাধন, শ্রীচক্রসম্বর স্তোত্র।

কুলদত্ত - ক্রিয়া সংগ্রহ পঞ্জিকা।

লুইপাদ - শ্রী ভগবদ অভিসময়, অভিসময় বিভঙ্গ।

ধর্মোত্তর - অপোহনাম প্রকরণ, ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি।

উদয়নাচার্য - কিরণাবলী প্রশস্ত পাদের আকর গ্রন্থ 'পদার্থধর্ম সংগ্রহ' এর টাকা, লক্ষণাবলি, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, আত্মতত্ত্ব বিবেক এবং লক্ষণমালা।

লক্ষ্মীঙ্কন - অদ্বয়সিদ্ধি।

উদয় কল্যাণ রক্ষিত- অন্যাপোহ বিচার কারিকা, শ্রুতিপরীক্ষা।

নাড়পাদ - একবীর হেরুক সাধন, গুহ্যসমাজ উপদেশ পঞ্চকর্ম, বজ্রযোগিনী।

মৈত্রেয় নাথ - অভিসময়ালঙ্কার।

নাড়াপাদ স্ত্রী নিগু - জ্ঞান ডাকিনী নিগু মার- উপায়মার্গ চণ্ডালিকা ভাবনা, চক্রসম্বর মণ্ডলবিধি, প্রণিধান রাজ, মহামার জ্ঞান।[৬৭]

সরোরু বজ্র - শ্রী বজ্রযোগিনি সাধন, হেবজ্র সাধন, বেজ্রমণ্ডণ বিধি।

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান-বোধিমার্গ প্রদীপ, প্রজ্ঞাপারমিতা পিণ্ডার্থ প্রদীপ, পঞ্চবিংশতি সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা (অষ্টসাহসিকা প্রজ্ঞাপারমিতা), মধ্যমোপদেশ সত্যদ্বয়বতার, সংগ্রহ গর্ভ, একবীর সাধন, বোধিসত্ত্ব মণ্যাবলী, মহাযান পথ সাধন বর্ণ সংগ্রহ, সূত্রার্থ সমুচ্চয়োপদেশ, শিক্ষা সমুচ্চয় অভিসময় উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আরো অনেক রয়েছে।

নাড়পাদ - বজ্রপদ সার সংগ্রহ, বজ্রগীতিকা, নাড়পণ্ডিত গীতিকা।[৬৮]

অনঙ্গব্রজ - শ্রী হেবজ্রসাধন।

দারিকাপাদ - বজ্রসত্ত্ব সাধন, বুদ্ধোদয়।

কুক্কুরিপাদ - মহামায়াতন্দ্রানুসারিনী হেরুক সাধনোপায়িকা, বজ্রসত্ত্ব সাধন।

ভূসুকু - শ্রীগুহ্যসমাজ মহাযোগ তন্ত্রবালাবিধি,সহজগীতি, চিত্তচৈতন্য শমনেপায়।

বৈরোচন - আচার্য বেরোচন গীতিকা।

কৃষ্ণাচার্য - দোঁহাকোষ, কাহ্নপাদ গীতিকা।

মাতৃচেট - মাতৃচেট গীতিকা, চতুঃশতক স্তোস্ত্র, শত পঞ্চশতিক স্তোস্ত্র।

কেরুনন্দ - প্রমাণ বার্তিক কারিকা, প্রমাণ বার্তিক বৃত্তি, ন্যায়বিন্দু।

লীলাপাদ - বিকল্প পরিহারগীতি।

স্থগণ - দেহাকোষতত্ত্ব গীতিকা।

শান্তি - সহজরতি সংযোগ, সহজযোগক্রম।

অদ্বয়বজ্র - দোহাকোষ নিধি পরিপূর্ণ গীতি-টীকা, দোহাকোষ হৃদয় অর্থগীতিটীকা নাম চতুরবজ্রগীতিকা

কম্বলস্বর পাদ - প্রজ্ঞাপারমিতা উপদেশ, কম্বলগীতিকা।

মহীপাদ - বায়ুতত্ত্ববগীতিকা।[৬৯]

রামচন্দ্র কবিভারতী - বৃত্তরত্নাকর, বৃত্তমালা, ভক্তিশতক প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

ক) ললিতবিস্তর : ললিতবিস্তর মিশ্রসংস্কৃত ও বিশুদ্ধ সংস্কৃতে রচিত একটি মূল্যবান গ্রন্থ। ললিতবিস্তর গ্রন্থের গ্রন্থকার ও রচনাকাল সঠিক জানা যায়নি। তবে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে। এই গ্রন্থে বুদ্ধের জীবন কাহিনীর বুদ্ধলীলার বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। 'ললিতবিস্তর' অর্থ বুদ্ধলীলার বিস্তৃত বর্ণনা। 'ললিত' অর্থ কলা, ক্রীড়া, কৌশল, ভাব। আর 'বিস্তর' অর্থ বর্ণনা, বিবরণ, বিশ্লেষণ, বিস্তার।[৭০] বুদ্ধজীবনের বিভিন্ন লীলা কাহিনী বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন বলে ললিতবিস্তর বলা হয়ে থাকে। গ্রন্থটি মূলত সর্বাস্তিবাদীগণের রচিত। মনীষী ওল্ডেনবার্গের মতে, অন্যান্য মহাযান গ্রন্থের

মতে ইহা পরবর্তীকালে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়।[৭১] আচার্য নরেন্দ্র দেবের মতে, গ্রন্থটিকে 'অভিনিষ্ক্রমণ সূত্র' তথা 'মহাব্যুহ'ও বলা হয়[৭২]। এই গ্রন্থটিতে সাতাশ অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়। বুদ্ধ তুষিত স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে মায়াদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ, বুদ্ধত্বলাভ এবং বারাণসীতে ধর্মচক্র প্রবর্তন পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও সিদ্ধার্থের শিক্ষা, দেবমন্দির পরিদর্শন, বিম্বিসারের দীক্ষা, যশোধরার সাথে বিবাহ, মারবিজয়, কৃষিগ্রামে ধ্যান, যুদ্ধবিদ্যা প্রদর্শন এসবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[৭৩] অনেকের ধারণা ললিতবিস্তরের উপর ভিত্তি করে অশ্বঘোষ 'বুদ্ধচরিত' গ্রন্থটি রচনা করেছেন।

খ) **বুদ্ধচরিত :** বুদ্ধচরিত অশ্বঘোষের রচিত একটি সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য। ইহাকে কবি মহাকাব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধচরিত গ্রন্থে মহামানব বুদ্ধের জীবনের ইতিহাসই আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থে বুদ্ধের জন্ম, ধর্মপ্রচার ও মহাপরিনির্বাণের ঘটনাগুলো বর্ণিত হয়েছে। সহজ-সরল সাবলীলভাবে বিভিন্ন উপমা, যুক্তি, ছন্দ, অলংকার ব্যবহারে কাব্যখানি সুখপাঠ্য ও উৎকৃষ্ট কাব্যগুণে ভূষিত।[৭৪] I-tsing এর মতে মূল সংস্কৃত 'বুদ্ধচরিত' ২৮ সর্গে বিভক্ত। তিব্বত ও চীনা ভাষায় ২৮ সর্গে অনুবাদ পাওয়া যায়। চীনা পরিব্রাজক ইৎ সিঙের মতে, সপ্তম শতাব্দীতে অশ্বঘোষের রচিত বুদ্ধচরিত ও সূত্রালঙ্কারের অংশ বিশেষ জনসমাজে গীতাকারে কীর্তিতে হত। 'বুদ্ধচরিত' সম্রাট কণিস্কের রাজত্ব কালে অর্থাৎ, খ্রিস্টীয় প্রথম শতক বা দ্বিতীয় মতকে রচিত হয়। বুদ্ধচরিত সম্পর্কে ইৎসিঙ বলেন, The extensive work relates the Tathagata's Chief doctrines and works during his life, from the period when he was still in the royal place till his last hour under the avenue of sala trees.It was widely read or sung through out the five divisions of India and the countries of Southern Sea. He cloths manifold meanings and ideas in a few words, which rejoice the heart of the reader, so that he never feels tired from reading the poem. Besides, it should be counted as meritorious for one to read this book, in as much as, it contains the noble doctrines given in a concise form.[৭৫] ইহা বুদ্ধের জীবন চরিত্রের গুণাবলি সমৃদ্ধ অসাধারণ একটি কাব্যধর্মী গ্রন্থ, যা সাহিত্য ভান্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ। এই গ্রন্থটি অশ্বঘোষের প্রসিদ্ধ কাব্যশৈলী এবং বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য জগতে অনন্য মহাকাব্য।

গ) **সৌন্দরনন্দ :** সৌন্দরনন্দ মহাকাব্য অশ্বঘোষের রচিত দ্বিতীয় গ্রন্থ। এই মহাকাব্যর সংস্কৃত নাম 'সৌন্দরনন্দম'। ইহা অশ্বঘোষের সৃস্টি। ১৯২৮ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজি অনুবাদসহ গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।[৭৬] এই মহাকাব্য বর্ণনা করা হয়েছে বুদ্ধের জীবন কাহিনী, শিক্ষা দর্শন ও উপদেশ বাণী। এছাড়াও কপিলাবস্তু নগরীর কথা, বুদ্ধ ও নন্দের জন্মের কথা, নিজপত্নী সুন্দরীর প্রতি নন্দের

আসক্তি, বুদ্ধ কর্তৃক নন্দের বৌদ্ধধর্মের দীক্ষা গ্রহণ, সুন্দরীর প্রতি আক্ষেপ, বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি ও শিক্ষার কথা বর্ণিত হয়েছে। সৌন্দরনন্দম কাব্য আঠারোটি সর্গে বিভক্ত করা হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ্রিস্টীয় ১৮৯৮ সৌন্দরনন্দ কাব্যটি নেপাল হতে তথ্য সংগ্রহ করে সম্পাদনা করেন।

ঘ) **অভিধর্ম কোষ :** বৌদ্ধ দার্শনিক আচার্য বসুবন্ধুর বৌদ্ধ সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রয়েছে। সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য 'অভিধর্ম কোষ' আচার্য বসুবন্ধুরই রচিত। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে আচার্য বসুবন্ধু এই বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেছেন। মতান্তরে আচার্য বসুবন্ধু সৌত্রান্তিক মতবাদের অনুসারী ও প্রচারক ছিলেন।[৭৭] অভিধর্মকোষের কারিকা ৫৯৮, মতান্তরে ৬০০।[৭৮] ইহা ৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে ধাতু নির্দেশ (কারিকা সংখ্যা ৪৮), দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্রিয় নির্দেশ (কারিকা সংখ্যা ৭৩), তৃতীয় অধ্যায়ে লোক নির্দেশ (কারিকা সংখ্যা ১০২), চতুর্থ অধ্যায়ে কর্ম নির্দেশ (কারিকা সংখ্যা ১২৭), পঞ্চম অধ্যায়ে অনুশয় নির্দেশ (কারিকা সংখ্যা ৭০), ষষ্ঠ অধ্যায়ে পুদ্গালমার্গ নির্দেশ (কারিকা সংখ্যা ৭৯), সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞান নির্দেশ (কারিকা সংখ্যা ৫৬), অষ্টম অধ্যায়ে নির্দেশে (কারিকা সংখ্যা ৪৩) বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থে পঞ্চস্কন্ধ, অষ্টাদশ ধাতু ও দ্বাদশ আয়তন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

ঙ) **সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্র :** মহাযান মতবাদীদের একটি প্রাচীন গ্রন্থ। সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্রটি মহাযান সূত্রাবলি হিসেবে বেশি পরিচিত। গিলগিট, নেপাল, মধ্য এশিয়ায় এর পংক্তি এবং চীনা সংস্করণ পাওয়া যায়। পুন্ডরীক বা শ্বেতপদ্ম বিশুদ্ধতা ও পূর্ণতার প্রতীক। পঙ্কজাত পদ্ম যেমন পঙ্কে না হয়েও সৌন্দর্যবর্ধন করে তেমনি বুদ্ধও পঙ্কিল জগতে আবির্ভূত হয়ে ক্লেশ পঙ্কে লিপ্ত না হয়ে জগতের উর্ধ্বে থাকেন। বুদ্ধের ধর্মের মর্মবাণী পুন্ডরীক তুল্য।[৭৯] সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্রে ২৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই গ্রন্থের রচয়িতা দার্শনিক নাগার্জুন। তিনি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচনা করেছেন। মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের সব বৈশিষ্ট্য এই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া তথা মধ্য এশিয়ার এটি পরিধি বিস্তৃত। বিশেষ করে চীন ও জাপানের টেন্ডাই ও নীচরেন সম্প্রদায়ের এ সূত্রটি মুখ্যগ্রন্থ। জাপানের জেন সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী মন্দিরে প্রতিদিন পাঠ করে থাকেন।

চ) **মাধ্যমিক কারিকা :** মাধ্যমিক কারিকা একটি দর্শন তাত্ত্বিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের রচয়িতা দার্শনিক নাগার্জুন (১৫০-২৫০)। ইহা ২৭টি অধ্যায়ের সমন্বয়ে রচিত। শ্লোকের সংখ্যা চারশত। গ্রন্থটি মূলত বিষয়বস্তু শূন্যতা, মধ্যমপথ। একে বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি প্রতিত্যসমুৎপাদও বলা হয়। মাধ্যমিক কারিকা শূন্যতা দর্শন তাত্ত্বিক কারণে বেশ জনপ্রিয় গ্রন্থ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা শূন্যতা শব্দের void, vacuity, non-substance, relativity শব্দের মাধ্যমে অর্থ নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। অনেক পণ্ডিতরা

শূন্যতাবাদকে সর্বনাস্তিবাদ বা উচ্ছেদবাদ এই অর্থে প্রয়োগ করেছেন।[৮০] ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া বলেছেন, গ্রন্থটি এখনো সংস্কৃত সংস্করণে পাওয়া যায়নি। চন্দ্রকীর্তি রচিত 'প্রসন্নপর্দা' শীর্ষক একটি ভাষ্যের সংস্কৃত সংস্করণ পাওয়া গেছে।[৮১] বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান এই দুটি ধারায় প্রবাহিত। নাগার্জুন মহাযানের মতাদর্শের অনুসারী। বিশেষত নাগার্জুনের পূর্বে রচিত মহাযান সূত্র, প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র, বৈপুল্যসূত্র এবং মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদ শাস্ত্র প্রভৃতিতে শূন্যবাদ তত্ত্বের বিক্ষিপ্ত সন্ধান পাওয়া যায়। ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী মনে করেন, বৈপুল্যবাদীদের উপর্যুক্ত মতবাদ মাধ্যমিক শূন্যবাদ দর্শনের বিকাশে ভূমিকা রাখে।[৮২] নাগার্জুন বিক্ষিপ্ততত্ত্বসমূহ সংগ্রহ করে গাঢ়বন্ধ রূপ প্রদান করেন। নাগার্জুন বৈপুল্যসূত্র পাঠ করে যে জ্ঞান অর্জন করেন, তার ভিত্তিতে দর্শন প্রতিষ্ঠা করেন। বৈপুল্যসূত্র মহাযানী গ্রন্থ।[৮৩] ভিত্তি হিসেবে মহাযান দর্শনকে চিহ্নিত করা যায়। বলা যায় মহাসাংঘিকদের ধর্মদর্শনই নাগার্জুনের দর্শনের সূতিকাগার। কারণ প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র তথা বৈপুল্যসূত্র মহাসাংঘিকদের ধর্মগ্রন্থ। নাগার্জুন স্বীয় প্রজ্ঞা ও প্রচেষ্টায় এ মহাযান দর্শনকে কেন্দ্র করে এক স্বতন্ত্র ধারার দর্শন প্রবর্তন করেন। এ সম্পর্কে কে. ভেঙ্কট রমণ বলেন, *The earlirest recension of these sutras may have been in existence about a century before Nagarjuna and the credit of bringing them to prominence by laying bare their profound teachings belongs to him. The depth of insight the rigour of logic and felicity of expression which he brought to bear upon his works as a teacher of the Mahayana, the way of wisdom,made a revolution almost starling in the history of Buddhist philosophy and influenced profoundly the subsequent philosophical thinking both within and outside the Buddhist fold.* [৮৪]

নাগার্জুন মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং এই সম্প্রদায়ের দর্শন মাধ্যমিক শূন্যবাদ নামে পরিচিত। শূন্যতা এ দর্শনের মূলভিত্তি।

ছ) **বোধিচর্যাবতার :** বোধিচর্যাবতার বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম একটি সাহিত্যকীর্তি গ্রন্থ। দার্শনিক শান্তিদেব এই গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থটির মূল ভাবধারা মহাযানী সম্প্রদায়ের ধর্মদর্শনের আলোকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে এটিই সবচেয়ে সমৃদ্ধ। তিনি বোধিসত্ত্বের নৈতিক আদর্শ, বুদ্ধত্বলাভের সংকল্প এবং মৈত্রী, করুণা, বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা এই গ্রন্থে তুলে এনেছেন। গ্রন্থটি নয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। দার্শনিক শান্তিদেব গ্রন্থটি রচনা করেছেন আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে। বোধি+চর্যা+ অবতার=বোধিচর্যাবতার। এখানে 'বোধি' অর্থ জ্ঞান, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি, চর্যা অর্থ আচরণীয় বা বিশেষ সাধনারীতি আর 'অবতার' অর্থ যুগের আবিভূত মহামানব। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

মতে, *'বোধিচর্যাবতারের ভাষা অতি সুললিত যেন বাণীর সুরে বাঁধা, ভাব অতি গভীর, সংক্ষিপ্ত ও সুমধুর।'*[৮৫]

জ) **অভিধর্ম মহাবিভাষা :** অভিধর্ম মহাবিভাষা বৈভাসিক সম্প্রদায়ের মূলবান মৌলিক গ্রন্থ। ইহার সংক্ষিপ্ত নাম মহাবিভাষা। ইহা কাশ্মীরে সম্রাট কণিস্কের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয়েছে। সম্রাট কণিস্ক কাশ্মীর-গান্ধার অঞ্চলের শাসনকর্তা থাকাকালীন বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। আচার্য ধর্মোত্তর রচিত অভিধর্মহৃদয়, আচার্য ধর্মত্রাত রচিত সংযুক্তাভিধর্মহৃদয়, আচার্য বসুবন্ধু রচিত অভিধর্মকোষ এবং আচার্য সংঘভদ্র রচিত অভিধর্মন্যায়ানুসার ও অভিধর্মসময়প্রদীপিকা।[৮৬]

ঝ) **অভিধর্মসার :** সর্বাস্তিবাদী অভিধর্ম পিটকের মহামূল্যবান অভিধর্মসার গ্রন্থটি অভিধর্ম হৃদয় শাস্ত্র নামে বেশি সমাদৃত। আচার্য ধর্মশ্রী খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দে গ্রন্থটির রচয়িতা। এই গ্রন্থে দশটি অধ্যায় নিয়ে অনূদিত। আচার্য উপশান্ত অভিধর্ম হৃদয় সূত্র নামে একটি টীকাগ্রন্থ রচনা করেন।[৮৭]

ঞ) **প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র :** মহাযানের মতাদর্শে বিভিন্ন সূত্রের মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রটি খুবই মূল্যবান। এই সূত্রে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের গুণের মহাত্ত্বতা ও মহাযান বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। মূলত দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, সমাধি ও প্রজ্ঞা ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। ইহা ভারতের পূর্বে এবং উত্তরে জনপ্রিয়তা বেশি সমাদৃত হয়েছিল।[৮৮]

৩) **অবদানসাহিত্য :** বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে অবদান সাহিত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য, যা সর্বাস্তিবাদী সম্প্রদায়ের বিশাল একটি স্থান দখল করে আছে। এখানে অপদান বা অবদান শব্দের অর্থ বীরত্বপূর্ণ কার্য, মহত্বপূর্ণ কার্য। গৌতম বুদ্ধের অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবন দর্শন আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। যার মূলে রয়েছে কুশলকর্ম বা অকুশল কর্মের ফল।[৮৯] অবদানশতক, মহাবস্তু, দিব্যাবদান, অশোকাবদানমালা, কর্মশতক, কল্পদ্রুমাবদানমালা, রত্নাবদানমালা, ব্রতাবদানমালা, ভদ্রকল্পাবদান, বদাবিংশত্যবদান, বিচিত্রকর্ণিকাবদান, সুমাগধাবদান, অবদানকল্পলতা, সুবর্ণবর্ণাবদান, মণিচুড়াবদান, অবদানসারসমুচ্চয়। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অবদান সাহিত্য গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হলো।[৯০]

ক) **অবদানশতক :** অবদানশতক সম্ভবত অবদান সাহিত্যে প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাকে সর্বাস্তিবাদ সাহিত্যে অন্তর্ভূক্ত। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমদিকে চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। ইহা দশটি অধ্যায়ে বা বর্গে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি বর্গে দশটি করে কাহিনীর সমন্বয়ে গ্রন্থটি রচিত। প্রথম অধ্যায়ে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি, তৃতীয় অধ্যায়ে ভবিষ্যৎ প্রত্যেক বুদ্ধ সম্পর্কে, দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্ম-জন্মান্তর বৃত্তান্ত সম্পর্কে, পঞ্চম অধ্যায়ে প্রেত সম্পর্কে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে পূর্বজন্মের পূণ্যকর্ম

সম্পর্কে, সপ্তম অধ্যায়ে অর্হৎগণের বংশপরিচয় সম্পর্কে, অষ্টম অধ্যায়ে অর্হৎগণ সকলেই নারী, নবম অধ্যায়ে অর্হৎগণ সকলেই নিস্কলুষ পুরুষ এবং দশম অধ্যায়ে অর্হৎ ফল লাভ সম্পর্কে।[৯১] অবদান শতকের কাহিনীগুলো সুবিন্যস্ত এবং গতানুগতিক রীতি অনুযায়ী বর্ণিত হয়েছে।

ত্রিপিটক-বহির্ভূত পালি সাহিত্য

ত্রিপিটক সংকলনের পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষ তথা শ্রীলংকা, বার্মা, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে প্রায় দেড় হাজার বছর পালি গ্রন্থ রচনার প্রভাব দেখা যায়। ত্রিপিটকের পর অর্থকথার পূর্বে মৌলিক গদ্য গ্রন্থ যেখানে বুদ্ধের ধর্ম দর্শন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে যুক্তি ও বিশ্লেষণমূলক সাহিত্যকর্ম, যাকে পালি সাহিত্যের ইতিহাসে ত্রিপিটক- বহির্ভূত মৌলিক গ্রন্থ বা Paracanonical Texts নামে স্বীকৃত। সূত্রসংগ্রহ, পেটকোপদেস, নেত্তিপকরণ এবং মিলিন্দপশ্ন। এসব গ্রন্থগুলোর রচনাকাল ও রচয়িতাদের পণ্ডিতমহলে মতানৈক্য থাকলেও ধারণা করা হয় খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে গ্রন্থগুলো রচনা করা হয়।[৯২] এ সব গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম ও দার্শনিক তাত্ত্বিক বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতে ধর্মীয় ইতিহাস, সমাজ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ত্রিপিটক-বহির্ভূত পালি সাহিত্য গ্রন্থগুলো হলো : অট্ঠকথা, দাঠাবংশ, গন্ধবংশ, টীকা, মিলিন্দপঞ্ঞা, নেত্তিপকরণ, পেটকোপদেস, বিশুদ্ধিমগ্গ, অভিধম্মাবতার, রূপারূপবিভাগ, উত্তরবিনিচ্ছয়, বিনয়বিনিচ্ছয়, মহাবোধিবংস, সাসনবংস, অভিধম্মত্থসংগহ, তেলকটাহগাথা, জিনচরিত, জিনালংকার, বিবিধব্যাকরণ, দীপবংস, মহাবংস, চুল্লবংশ, বংসমালিবিলাসিনী, মহাবোধিবংশ, থূপবংশ, দাঠাবংস, নালতধাতুবংশ, ছকেসাধাতুবংস, হত্থবনগল্লবিহারবংশ, সমন্তকূটবণ্ণনা, সংগীতিবংশ, আনাগতবংশ, গন্ধবংশ, দন্তবংস, সদ্ধম্মসংগহো, দসবোধিসত্তুদ্দেস, দসবোধিসত্তুপ্পত্তিকথা, চামদেবীবংশ, জিনকালমালী, পঞ্চবুদ্ধব্যাকরণ, বংসদীপনী, থাথনালংকার, থাথনাঅসিনসেক, সাসনবংস, অভিধান, ছন্দ ও অলংকার। ত্রিপিটক-বহির্ভূত পালি সাহিত্যকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন– ১. অর্থকথা পূর্ববর্তী মৌলিক গ্রন্থ, ২. অর্থকথা (পালি অট্ঠকথা) বা টীকাগ্রন্থ, ৩. বংশসাহিত্য বা ইতিহাসাশ্রয়ী কাব্যগ্রন্থ, ৪. সারগ্রন্থ, সংকলন গ্রন্থ, ৫. অন্যান্য কাব্য ও গদ্যগ্রন্থ, ৬. ব্যাকরণ, অভিধান, ছন্দ ও অলঙ্কার। উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্রন্থের বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো–

১. **অট্ঠকথা :** অট্ঠকথা পালি শব্দ। এর বাংলা হলো অর্থকথা বা ভাষ্য।[৯৩] ইংরেজিতে Commentary বলে। এর রচয়িতা বুদ্ধদত্ত, বুদ্ধঘোষ ও ধর্মপাল উল্লেখযোগ্য। পালি ত্রিপিটক সাহিত্য কেন্দ্র করে অর্থকথার উদ্ভব হয়। এই গ্রন্থের বিশেষ দিক হলো বুদ্ধের ধর্ম দর্শনের জটিল বিষয়গুলোর মূলভাব বুদ্ধের শিষ্য প্রশিষ্যগণ উদাহরণ, উপমা, গল্প, কাহিনী সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা করতেন, যা পালি সাহিত্যের অট্ঠকথা নামে খ্যাত। অর্থকথা ত্রিপিটক-বহির্ভূত পালি গ্রন্থ। ইহা স্বতন্ত্র সাহিত্যকর্ম

হিসেবে পরিচিত। ঐতিহাসিক ঐতিহ্য সাক্ষ্য বহন করে যে, সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ত্রিপিটকের সাথে অর্থকথাও শ্রীলংকায় নিয়ে গিয়েছিলেন; যা খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে ত্রিপিটকের সাথে ভূর্জপত্রে শ্রীলংকা ভাষায় লিপিবদ্ধ ছিল। শ্রীলংকা ঐতিহ্যমতে টীকাগুলো মূলগ্রন্থগুলোর সাথে প্রথম সঙ্গীতির সময় হতে প্রচার হতে থাকে।[৯৪] শ্রীলংকার রাজা বট্টগামনীর সময়ে রচনা হয়েছে বলে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়। শ্রীলংকার মহাবিহারে অট্ঠকথা রচিত হয়েছিল মতপ্রকাশ করেন। সে অর্থকথাসমূহকে শ্রীলংকা অট্ঠকথা নামে পরিচিত। বর্তমানে যে সমস্ত অর্থকথা বা টীকা পাওয়া যায়, সেগুলোর অধিকাংশই শ্রীলংকা ভাষায় রচিত। অর্থকথার রচনাকাল খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে বলে ধারণা করা হয়।[৯৫] পালি অটঠকথা সমন্তপাপাসাধিকার (বিনয়ের অট্ঠকথা) নিদান অংশ এরূপ উল্লেখ আছে :

"সংবণণনং তঞ্চ সমারভন্তো,
তস্মা মহা-অটঠকথাং সরীরং,
কত্বা মহাপচ্চরিয়ং তথেব,
কুরুন্দিনামাদিসু বিসসুতাসু।"

ক) মিলিন্দপঞ্হা : বৌদ্ধ সাহিত্যে মৌলিক গ্রন্থগুলোর মধ্যে মিলিন্দ প্রশ্ন একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ। ইহা গ্রিক রাজা ও ভিক্ষু নাগসেনের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে, উপমা, গল্প ও উদাহরণ আকারে বৌদ্ধধর্মের জটিল তত্ত্বের সমস্যা সমাধানের বিষয়গুলো এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটি চীনা, তিব্বতী, বার্মীজ, শ্যামী ভাষায় বহুবার অনুবাদ করা হয়। ইহা সাতটি খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থটিতে তাঁদের দুজনের সাথে যুক্তি ও ধর্মতত্ত্বের বিশালত্ব বিষয়ে যে বিশ্লেষণ, তা বিশ্বসাহিত্যে বিশেষ স্থান করে আছে। এই গ্রন্থের রচয়িতার নাম পণ্ডিতদের এখনো অজানা। তবে ধারণা করা হয় যে, জনপদ, নগর, স্থান, নদ নদীর নাম প্রভৃতির ভৌগোলিক বিবরণী থেকে পাওয়া যায়; তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসী ছিলেন।[৯৬] গ্রিক ও ভারতীয় তথ্য হতে জানা যায় মিনেন্ডার উত্তর পশ্চিম ভারতীয় অঞ্চলে অনেক বছর রাজত্ব করেছিলেন। ধারণা করা হয়, তিনি বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ধার্মিক রাজা হিসেবে রাজত্ব করেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর একশত বছর মধ্যে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল।রীজ ডেভিড্স গ্রন্থকারের একটি কাল্পনিক নাম দিয়েছেন 'মাণব'।[৯৭] এই গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ধর্মীয় নেতাদের মতবাদ, অপরাধ ও দন্ডবিধি, রোগব্যাধি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

খ) নেত্তি-পকরণ : অর্থকথার পূর্ববর্তী আরেকটি পালি বৌদ্ধ সাহিত্য নেত্তি-প্রকরণ গ্রন্থ। ইহার রচনাকাল ও রচয়িতার বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। এই গ্রন্থে ধর্মসঙ্গীনি ও বিভঙ্গের বিষয়গুলো গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে।[৯৮] আচার্য ধর্মপাল খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নেত্তির টীকাগ্রন্থ রচনা করেন।

গ) **পেটকোপদেশ :** ত্রিপিটক-বহির্ভূত পালি সাহিত্যের মধ্যে পেটকোপদেশ একটি মহামূল্যবান মৌলিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি মহাকচ্চান রচনা করেন। ইহা পিটকের উপদেশ ও নেত্তির মতো বুদ্ধের জ্ঞানলাভের কথা আলোচনা করা হয়েছে। পালি ত্রিপিটকের সংযুক্ত নিকায় ও অঙ্গুত্তর নিকায় থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে গ্রন্থটি রচনা করেন।[৯৯]

২. **অর্থ অর্থকথা (পালি অট্ঠকথা) বা টীকাগ্রন্থ :** কথাসাহিত্যে বর্ণনানুসারে আরো স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে পালি ভাষায় রচিত সাহিত্যকর্ম সৃষ্টিই যে ইতিহাস তা পালি সাহিত্যের টীকা নামে পরিচিত। ইহা শ্রীলংকায় রচিত হয়। 'সদ্ধম্ম-সংগহো' গ্রন্থ মতে, অট্ঠকথা রচিত হওয়ার আনুমানিক ছয়শত তিরাশি বছর পর এই গ্রন্থটি রচিত শ্রীলংকার রাজা পরাক্রম বাহুর রাজত্বকালে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা করা হয় খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে। শ্রীলংকার রাজা পরাক্রম বাহুর পৃষ্ঠপোষকতায় টীকার সূচনা হয়, যা সতেরো শতক অবধি ছিল।[১০০] অট্ঠকথা অনুসারে টীকা বিভিন্ন শ্রেণি উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন– মহাটীকা, পুরাণটীকা, মূলটীকা, নবটীকা, অভিনবটীকা এবং অনুটীকা। 'গন্ধবংস'[১০১] গ্রন্থেও রচয়িতার নামসহ বিভিন্ন শ্রেণির টীকাগ্রন্থ নাম পাওয়া যায়।

সারত্থদীপনী	:	সামন্তপাসাদিকা এর টীকা
বিনয়ত্থ মঞ্জূসা	:	কঙ্কাবিতরণী এর টীকা
কঙ্খাবিতরণীপোরাণ টীকা	:	কঙ্খাবিতরণী এর পুরাণোটীকা
লীনত্থপ্পকাসিনী	:	দীর্ঘ, মজ্ঝিম এবং সংযুক্ত নিকায়ের টীকা
সারত্থমঞ্জূসা	:	অঙ্গত্তরনিকায়ের টীকা
অত্থ সালিনীমূলটীকা	:	অত্থসালিনীর টীকা
বিভঙ্গমূল টীকা	:	বিভঙ্গ এর টীকা
পঞ্চিকায	:	মোগ্গল্লায়ন ব্যাকরণ টীকা
বিসুদ্ধিমগ্গমহাটীকা	:	বিসুদ্ধিমগ্গ গ্রন্থের টীকা
অভিধর্মত্থ প্রকাসনী	:	অভিধম্মাবতার টীকা
জিনলংকারপকরণ নবটীকা	:	জিনলংকার গ্রন্থের টীকা
ন্যাসপকরণ মহাটীকা	:	ন্যাসপকরণ গ্রন্থের টীকা
পেটকালংকার	:	নেত্তিপকরণ এর মহাটীকা।

ক) **বিশুদ্ধিমার্গ :** অর্থকথা বা টীকা গ্রন্থে বুদ্ধঘোষের অনবদ্য গ্রন্থ বিশুদ্ধিমার্গ। প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধিমার্গ হলো ত্রিপিটকের সংক্ষিপ্তরূপ, বুদ্ধবচনের সারগ্রন্থ। এই গ্রন্থটিতে নির্বাণ সম্পর্কে উপদেশবাণী সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ইহাকে ২৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছে। এই গ্রন্থকে আবার তিনটি অংশে

বিভক্ত। যথা-শীলনির্দেশ, চিত্ত বা সমাধি নির্দেশ ও প্রজ্ঞা নির্দেশ। বিশুদ্ধি অর্থ নির্বাণকে বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ নির্বাণ লাভের উপায়কে বোঝানো হয়েছে।

৩. **বংশসাহিত্য বা ইতিহাসাশ্রয়ী কাব্যগ্রন্থ :** শ্রীলংকা ও বার্মার ইতিহাস বিশ্লেষণকালে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন তত্ত্বে ভরপুর। উভয় দেশের ভিক্ষুগণ ইতিহাস সমৃদ্ধ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন যা পালি বংশ সাহিত্য নামে খ্যাত। এখানে পালি বংশ শব্দের অর্থ ধারা, বংশক্রম, ইতিহাস প্রভৃতি। গৌতম বুদ্ধ তথা পূর্ব বুদ্ধগণের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। এই সাহিত্যের বিস্তৃতি বৌদ্ধধর্ম ও সংঘের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তখনকার সামাজিক, রাজনৈতিক ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থার বিবরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বংশ সাহিত্যগুলোর মধ্যে দীপবংশ, মহাবংশ, চুল্লবংশ, মহাবোধিবংশ, থুপবংশ, দাঠাবংশ, হত্থবনগল্লবিহারবংশ, অনাগতবংশ, ছকেসধাতুবংশ, গন্ধবংশ, শাসনবংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিচে কয়েকটি মূল্যবান বংশ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো।

ক. দীপবংশ : দীপবংশ শ্রীলংকা রচিত ইতিহাস্যশ্রয়ী কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম। ওলল্ডেনবার্গের[১০২] মতে, দীপবংশ রচনাকাল খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে। বুদ্ধঘোষের সময় সিংহলে গ্রন্থসমূহের মধ্যে দীপবংশ অন্যতম গ্রন্থ। তিনি কথাবত্থু অর্থকথার ভূমিকা দীপবংশ উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[১০৩] গাইগার বলেছেন দীপবংশ হল mnemonics কবিতা অর্থাৎ স্মৃতিসহাযক কবিতা।[১০৪] বিনয় পিটকের পবিবার পাঠে দীপবংশের অনুরূপ গাথা আছে। এই গ্রন্থে বৌদ্ধসংঙ্গতি, অশোকের কাহিনী, মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রার ধর্ম প্রচার, শ্রীলংকাগমন, শ্রীলংকাল রাজাদের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। বুদ্ধ তিনবার সিংহলে গমনের কাহিনীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে,[১০৫]

খ. মহাবংশ : মহাবংশ পালি সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিখ্যাত গ্রন্থ। দীপবংশ-এর মতো শ্রীলংকা রচিত মহাবংশ একটি ইতিহাসাশ্রয়ী পালি মহাকাব্য।[১০৬] এটি ভারত ও শ্রীলংকার ইতিহাস এবং বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। দীপবংশের প্রায় এক শতাব্দী পরে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতব্দীতে রাজা মহাসেনের অনুপ্রেরণায় কবি মহানাম গ্রন্থটি রচনা করেন। শ্রীলংকার ইতিহাস আলোচনায় তিনজন মহানাম নামে উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমজন সদ্ধম্মপ্পকাসিনীর রচয়িত দ্বিতীয়জন মহাবংশের রচয়িতা তৃতীয়জন নামে উল্লেখ পাওয়া যায় শীলালেখাতে যিনি বুদ্ধমূর্তি ও বিহার নির্মাণ করেছিলেন বলে শীলালেখাতে সাক্ষ্য প্রমাণ দেয়। তবে গবেষকদের মধ্যে ভিন্ন মত রয়েছে। তারা এখনো নিশ্চিত হতে পারেননি। গন্ধবংশ গ্রন্থে[১০৭] অর্থকথাচার্য মহানাম সিংহলে আচার্য হিসেবে উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাবংশ ও দীপবংশ গ্রন্থ দুটি অনেকটা অনুরূপ। ইহার বিষয়বস্তু, ঘটনা, সুসংবদ্ধ। মহাবংশের বিষয়বস্তু বিস্তৃত, কাব্যিক আকারে শব্দচয়ন করা হয়েছে। এই গ্রন্থের ভাষা

শব্দচয়ন, সহজ, সরলভাবে রচনা করা হয়েছে। তাই গ্রন্থটিকে মহাকাব্য হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই গ্রন্থ বুদ্ধ শ্রীলংকা গমন, বংশপরিচয়, সঙ্গীতি, সংঘভেদের কাহিনী অশোকের জীবন কাহিনী, রাজাদের কাহিনী, মহেন্দ্র ও সংঘামিত্রার ধর্ম প্রচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।[১০৮]

গ. **দাঠাবংশ :** দাঠাবংশ বা দন্তধাতুবংশ বংশ সাহিত্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। এটি বুদ্ধের দন্তধাতুর ইতিহাস সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থটি ধর্মকীর্তি কর্তৃক থেকে ত্রয়োদশ শতকে প্রথম ভাগে রচিত হয়েছে। তিনি একজন লেখক ও পণ্ডিতপ্রবর। তিনি সংস্কৃত ভাষায়ও সুপণ্ডিত। H. Kern এর ৩১০ খ্রিস্টাব্দে দলদাবংশ নামে খ্যাত ছিল। মহাবংশ ও দীপবংশের চেয়ে দাঠাবংশ কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইহার প্রয়োজনীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই প্রসঙ্গে ড. বিমলাচরণ লাহার অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তার মতে, "*The Dathavamsa is an improtant contribution to the history of pali Buddhist literature. It is an historical record of the incidents connected with the tooth-relic of the Buddha. It is as improtant as the Mahavamsa and Dipavamsa. The history of Ceylon would be incomplete without it.*"[১০৯]

ঘ. **থূপবংশ :** পালি বংশ সাহিত্যের মধ্যে আর একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থ থূপবংশ[১১০] বৌদ্ধ স্তুপ সম্পর্কে ভারত ও শ্রীলংকায় তথাগত বুদ্ধের ধাতু স্তুপ নির্মাণের কাহিনী এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 'থূপ' বা সংস্কৃত 'স্তুপ' শব্দের বাংলা অর্থ 'চৈত্য' এবং পালিতে 'চেতিয' বলা হয়, যা মহাপরিনির্বাণে সূত্রে উল্লেখ রয়েছে।[১১১] শ্রীলংকার মহাযানী ভিক্ষু ড. বাচিশ্বর এই গ্রন্থের রচয়িত।

ঙ. **গন্ধবংশ :** পালি বংশ সাহিত্যের গন্ধবংশ একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ। এটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ হলেও গুরুত্বের দিক থেকে অনেক মূল্যবান। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রন্থটি বার্মা দেশে আচার্য নন্দপঞ্ঞ রচনা করেন। গন্ধ শব্দের অর্থ গ্রন্থ এবং বংশ শব্দের অর্থ ইতিহাস সুতরাং গন্ধবংশ অর্থ গ্রন্থের ইতিহাস। মিনায়েক [১১২] 'গন্ধবংশকে ইংরেজিতে Book history এবং আশা দাস[১১৩] The glipsers of pali literature of or the chromisle of the Pali book হিসেবে অভিহিত করেছেন। ইহা পালি ভাষায় রচিত প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবেও অভিহিত হয়। গ্রন্থটি ২৭টি পৃষ্ঠায় রচিত। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০টি করে লাইন। মিনায়কের মতে, পাণ্ডলিপি এম.এস.এম. অসংখ্য ভুলে পরিপূর্ণ ছিল।[১১৪]

চ. **মহাবোধিবংস :** ভারতের বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষকে কেন্দ্র করে এই মহাবোধিবংশ কাব্যগ্রন্থটি শ্রীলংকায় রচিত হয়। বুদ্ধ এই বৃক্ষতলে বসে ছয়বছর কঠোর তপস্যা করে বুদ্ধত্বজ্ঞান লাভ করেন। এর রচয়িতা উপতিষ্য স্থবির। Geiger-এর মতে গ্রন্থটি খ্রিস্টাব্দ দশম শতাব্দীতে রচিত হয়েছে বলে মনে করেন।[১১৫] এই গ্রন্থে গ্রন্থকার বুদ্ধত্ব হতে পরিনির্বাণ পর্যন্ত জীবনকাহিনী, তিন সঙ্গীতি, মহেন্দ্র

শ্রীলংকায় ধর্মপ্রচার, সংঘমিত্রার বোধিবৃক্ষ নিয়ে শ্রীলংকায় গমন প্রভৃতি বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। পূর্বসুরীদের তথ্য গ্রহণ করে লেখক নতুন আঙ্গিকে কাব্যগ্রন্থটি রচিত হয়েছে।

ছ. শাসনবংশ : শাসনবংশ একটি মহামূল্যবান পালি গ্রন্থ। গ্রন্থটি পণ্ডিত পঞ্ঞাসামী বার্মায় রচনা করেন ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে। লেখক দীপবংশ, মহাবংশ, অর্থকথা ও বার্মার ইতিহাস থেকে উপদান গ্রহণ করে গ্রন্থটি রূপদান দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির শাসনবংশ কাব্যগ্রন্থটি বঙ্গানুবাদ করেন।[১১৬] এই গ্রন্থে লেখক বুদ্ধের জীবনপ্রণালি, তিন সঙ্গীতি, অশোকের ধর্মপ্রচার, শ্রীলংকার সাথে সম্পর্ক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

জ. চুল্লবংশ : মহাবংশের পরবর্তী সময়ে শ্রীলংকায় রচিত ক্ষুদ্র ইতিহাস সমৃদ্ধ কাব্যগ্রন্থ চুল্লবংশ। ইহা মহাবংশের সমসাময়িক গ্রন্থ বলে মনে করা হয়। গ্রন্থটি ১০০টি অধ্যায় সন্নিবেশিত। গ্রন্থটির ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ধর্মকীর্তি স্থবির রচনা করেন। এই গ্রন্থে দীপবংশ ও মহাবংশে শ্রীলংকার রাজাদের বিবরণ পাওয়া যায়। এছাড়াও শ্রীলংকার রাজা পরাক্রম বাহুর মহত্ত্ব ও বীরত্বের কাহিনী তথ্য নিয়ে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে।

৪. **সারগ্রন্থ :** পালিসাহিত্য সমূহ বৌদ্ধধর্ম ইতিহাসে বিশেষ একটি স্থান দখল করে আছে। পালি সাহিত্যের ইতিহাস সমৃদ্ধ তত্ত্বগুলো আরো শ্রুতিমধূর ও পাঠ উপযোগী করার উদ্দেশ্যে যে শ্রেণির সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি হয়; যাকে পালি সাহিত্যে ইতিহাসে সারসংক্ষেপ বা সারগ্রন্থ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। খ্রিস্টাব্দ পঞ্চম থেকে পনেরো শতকের মধ্যে গ্রন্থগুলো রচিত হয়।[১১৭] এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : অভিধম্মাবতার, রূপারূপবিভাগ, উত্তরবিনিচ্ছয়, বিনয়বিনিচ্ছয়, অভিধম্মত্থসংগহ, নামরূপপরিচ্ছেদ, খুদ্দকসিকখা, পারিমুত্তকবিনযবিনিচ্ছযসংগহ, বিমতিবিনোদনী, সীমালংকারসংগহ, পরমত্থবিনিচ্ছয, সচ্চসংখেপ, নামরূপসমাস, নামচারদীপক এবং মোহবিচ্ছেদনী

৫. **সংকলন গ্রন্থ :** ত্রিপিটক থেকে তথ্য সংগ্রহ পালিভাষাকে আরো গবেষণা, উপযোগী ও গ্রহণযোগ্যতা করার জন্য এক শ্রেণি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যগ্রন্থ রচিত হয়, যা পালি সাহিত্য ইতিহাসে সংকলন গ্রন্থ নামে বেশি সমাদৃত। এই জাতীয় গ্রন্থগুলো দ্বাদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকে রচিত।[১১৮] নিম্নে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ : সারসংগ্রহ, উপসকজনালংকার, মঙ্গলত্থদীপনী, পটিপত্তিসংগহ, বেস্সন্তরদীপনী, পঠমসম্বোধি এবং জিনমহানিদান।

৬. **অন্যান্য কাব্য ও গদ্যগ্রন্থ :** বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন বিষয়ে যে সব পালি ভাষা ছন্দ আকারে কাব্য গ্রন্থ রচনা করা সেগুলোর মধ্যে তেলকটাহ গাথা, জিনচরিত, জিনালংকার অন্যতম। গ্রন্থগুলো মূলত শ্রীলংকার মধ্যে রচিত হয়, যেগুলোর রচনাকাল খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ হতে চৌদ্দ শতকের দিকে।[১১৯] এ জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : পজ্জমধু, তেলকটাহগাথা, জিনচরিত, জিনালংকার, সাধুচরিতোদয়, জিনবোধাবলী,

কাযবিরতিগাথা, সম্বুদ্ধগাথা, নরদেবতাগাথা, চীরত্থিগাথা, বীসতিওবাদগাথা, দানসত্থরি, সব্বদানবণ্ণনা, অন্তবুদ্ধবণ্ণাগাথা, অটঠবীসতিবুদ্ধনাগাথা, অতীতানাগতপচ্চুপন্ন, বুদ্ধবণ্ণনাগাথা, অসীতিমহাসাবকবণ্ণনাগাথা, সদ্ধম্মোপায়ন এবং নবোহারগুণবণ্ণনা।

(ক) তেলকটাহগাথা : তেলকটাহগাথা সংস্কৃত শতকের ক্ষুদ্র পালি কাব্যগ্রন্থ। উইনটারনিজ ও মালালাসেকর মনে করেন, ইহা দ্বাদশ শতকের দিকে রচিত। ইহা পাঠকে মনোযোগ আকর্ষণ করা একটি রস সাহিত্যমূলক গ্রন্থ। ইহা সাহিত্য বিচারে উৎকৃষ্ট কাব্যসরূপ সকলের কাছে সমাদৃত। এই গ্রন্থকে নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত, যথা-রতনত্তয়, মরণানুস্সতি, নিচ্চলক্খণ, দুক্খলক্খণ, অনত্তলক্খণ, অসুভলক্খণ, দুচ্চরিত আদীনব, চতুরারক্খা ও পটিচ্চসমুপ্পাদ প্রভৃতি।

৭. **ব্যাকরণ, অভিধান, ছন্দ ও অলঙ্কার :** পালি ভাষা সাহিত্যে ব্যাকরণের উপর অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ইহার অনেক অভিধান বা শব্দকোষ গ্রন্থের রচনাও পালি সাহিত্যে দেখা যায়। ইহা দ্বাদশ হতে পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি রচিত হয়। এই শতকে বার্মার পাগানরাজ নরপতিসিথুর (১১৬৭-১২০২) শিক্ষক অগ্গবংশ এছাড়াও ছন্দ ও অলংকার বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করা হয় যার মধ্যে সুবোধালংকার ও বুত্তোদয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

৮. **অধিবিদ্যা সম্পর্কীয় গ্রন্থ :** পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্বে মানবজীবনকে ইহকাল ও পরকালের গতি পরিবর্তনে শ্রীলংকা এবং বার্মায় পালি ভাষার উপর খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে একশ্রেণির গ্রন্থ রচনার উল্লেখ পাওয়া যায়।[১২০] গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্যহলো পঞ্চগতিদীপনী, ছগতিদীপনী, লোকপঞ্ঞত্তি, লোকপ্পদীপকস্র, ওকাসদীপনী, চক্কবালত্থদীপনী, চন্দসুরিযগতিদীপনী।

৯. **সংকলিত গল্প সংগ্রহ :** বুদ্ধের জীবন ও ধর্ম-দর্শনের নানা কাহিনীর সংকলনে পালি ভাষায় গল্প জাতীয় একশ্রেণির সংকলন গ্রন্থ রচিত হয়। বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের দান, মঙ্গলময়কর্ম এবং পরাত্ম-সেবায় উদ্বুদ্ধ করাই এ জাতীয় গ্রন্থসমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য।[১২১] রচনাকাল বিচারে দেখা যায়, এ জাতীয় গ্রন্থগুলো খ্রিস্টীয় চৌদ্দশ শতক থেকে পনের শতকের মধ্যে রচিত হয়েছিল। এ শ্রেণির গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : দসদানবত্থুপ্পকরণ, সহস্সবত্থুপ্পকরণ, মধু/ রসবাহিনী, সীহলবত্থুপ্পকরণ।

১০. **নীতিশাস্ত্র :** বিষয়বস্তু বা ব্যক্তির স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম বিষয়ে পালি ভাষায় একশ্রেণির গ্রন্থ রচিত হয়, যা পালি সাহিত্যের ইতিহাসে নীতিশাস্ত্র নামে পরিচিত। মূলত শ্রীলংকায় এ জাতীয় গ্রন্থ রচনা প্রথম সূচনা হয়, যা পরবর্তীকালে মিয়ানমার (বার্মা) এবং থাইল্যান্ডেও বিকাশ লাভ করে। এ জাতীয় গ্রন্থসমূহের রচনাশৈলী ও ভাব ভারতীয় সাহিত্য বিশেষত সংস্কৃত হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র এবং জাতক সাহিত্য দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত এবং গ্রন্থগুলো পদ্য এবং গদ্য আকারে রচিত। রচনাকাল পর্যালোচনায় দেখা যায়,

এ জাতীয় গ্রন্থগুলো খ্রিস্টীয় ষোড়শ এবং অষ্টাদশ শতকের মধ্যে রচিত হয়েছিল।[১২২] এ জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম হলো ধম্মনীতি, লোকনীতি, রাজনীতি, মহারহনীতি, লোকনেয্যপ্পকরণ এবং মনুস্সবিন্যেয।

১১. গল্পগ্রন্থ : জাতক সাহিত্য সারা বিশ্বে ব্যাপক জনপ্রিয়। থাইল্যান্ডে জাতক সাহিত্যে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয় বস্তু এবং বুদ্ধের জীবন-দর্শন নিয়ে গল্প জাতীয় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রন্থ রচিত হয়, যা থাইল্যান্ডে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। রচনাকাল পর্যালোচনায় দেখা যায়, অধিকাংশ গ্রন্থেরই রচনাকাল অনুল্লেখিত। তবে ধারণা করা হয়, থাইল্যান্ডে এ জাতীয় গ্রন্থসমূহ খ্রিস্টীয় চৌদ্দশ শতকে দিকে রচিত হয়েছিল। এ জাতীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : সিবিজযজাতক, সোতত্থকীমহানিদান, জাতত্থকীনিদান, মালেয্যত্থেরবত্থু, তুণ্ডিলোবাদসুত্ত, নিব্বানসুত্ত, আকারবত্তারসুত্ত।

উপসংহার : গৌতম বুদ্ধের সমকালীন ভারতের আত্ম-সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক অবস্থার প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে যে আলোচনা; তা বৌদ্ধসাহিত্য হিসেবে গণ্য করা হয়। বৌদ্ধসাহিত্যকে প্রকৃতপক্ষে পালি বৌদ্ধসাহিত্য, সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্য এই দুই ভাষায় বেশি প্রচলনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়াও ত্রিপিটক-বহির্ভূত বৌদ্ধসাহিত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর বিশেষ করে প্রথম সঙ্গীতি হতে তাঁর শিষ্যপরম্পরা বুদ্ধবাণী সংকলনে উদ্যোগ নেন। বুদ্ধ সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে সমগ্র বিশ্বে সুখ-শান্তি ও কল্যাণে বুদ্ধ অহিংসার উপদেশ বাণী প্রচার করেন। বুদ্ধের উপদেশ বাণীর মূলমন্ত্র ছিল মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, মানবতা তথা বিশ্বমৈত্রীর কথা বলেছেন। বুদ্ধের জীবদ্দশায় ত্রিপিটক সংকলনের তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে পণ্ডিতদের ধারণানুযায়ী ত্রিপিটকের সূত্র, বিনয়গুলো অনেকটা বুদ্ধের মুখনিঃসৃত উপদেশ ও নির্দেশিত বাণী। বুদ্ধের উপদেশ কখন, কোথায়, কোনো প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন তার নির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ নেই। তবে বৌদ্ধশাস্ত্রবিদদের রচিত বৌদ্ধসাহিত্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পরে বুদ্ধের শিষ্য মহাকশ্যপের সভাপতিত্বে পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে রাজগৃহে সপ্তপর্ণী গুহায় সূত্রধর আনন্দ ও বিনয়ধর উপালির বদান্যতায় প্রথম সঙ্গীতির আয়োজন হয়েছিল; তা ত্রিপিটকের যাত্রা বলে ধারণা করা যায়। পরবর্তী সময়ে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর দিকে মোগ্গলিপুত্র তিষ্য স্থবিরের সভাপতিত্বে পাটলিপুত্র নগরে তৃতীয় সঙ্গীতিতে দর্শন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সেই সময়কালে অভিধর্ম পিটকের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। তৃতীয় সঙ্গীতিতে ত্রিপিটকের সূচনা বলে মনে করা হয়। এখানে উল্লেখ্য, অশোকের শিলালিপি হতে জানা যায় তৃতীয় সঙ্গীতিতে কথাবত্থু গ্রন্থটিও রচিত হয়, যা বর্তমানে পালি ত্রিপিটক নামে খ্যাত। পালি সাহিত্য এক বিশাল বৈচিত্র্যময় সাহিত্যভান্ডারের রূপদান করেছে, যা গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক ফলপ্রসূ হবে। বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারে পালি ভাষা সাহিত্যে একটি স্থান দখল করে আছে। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে ধারণা করা যায় যে, পালি

ও সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যকর্মকে সমৃদ্ধ করেছে। **ত্রিপিটক-বহির্ভূত** বৌদ্ধসাহিত্যেও বুদ্ধের জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও সাংঘিক বিধি-বিধান, জীবনী গ্রন্থ, ভবিষ্যদ্বক্তা-সম্মন্ধীয় গ্রন্থ, চিকিৎসাশাস্ত্র, চিঠি এবং অনুশাসনের ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্ম দর্শন বিশেষভাবে বৈচিত্র্য এনেছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ :

১. বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী, *বৌদ্ধ সাহিত্য*, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৪. V. Trenckner, *Majjhima Nikaya*, I. Pali Text Society, London, 1888, p. 133.
৫. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, *পালি ভাষার ইতিবৃত্ত*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১২৫।
৬. সাধক শিশির বড়ুয়া চৌধুরী, *ত্রিপিটক পরিচিতি*, ইন্টারস্পেস মার্কেটিং এন্ড কমিউনিকেশন, চট্টগ্রাম, ২০১৭, পৃ. ২২।
৭. সুদর্শন বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি*, ১ম খণ্ড, ময়নামতি আর্ট প্রেস, চট্টগ্রাম, ২০০৭, পৃ. ৩৭।
৮. *ত্রিপিটক পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।
৯. *ত্রিপিটক পরিচিতি*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২।
১০. *ত্রিপিটক পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।
১১. *বৌদ্ধ সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।
১৩. *ত্রিপিটক পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।
১৭. *বৌদ্ধ সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।
১৮. *ত্রিপিটক পরিচিতি*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।
১৯. *ত্রিপিটক পরিচিতি*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।
২০. *বৌদ্ধ সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।
২৩. *বৌদ্ধ সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।
২৫. C. P. F. Rhys Davids ed. And tr., Visuddhimagga. Pali Text Society, London (1975), p.16
২৬. M. Winternitz, HIL.II, Munsiram Monohalal Publishers, New Dilhi, India. (1991), p, 22, n.2
২৭. *ত্রিপিটক পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

৩০. *ত্রিপিটক পরিচিতি*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

৩১. *ত্রিপিটক পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৩৩. *বৌদ্ধ সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

৩৫. *ত্রিপিটক পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

৩৬. *বৌদ্ধ সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

৩৭. *ত্রিপিটক পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

৩৮. *বৌদ্ধ সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

৩৯. M. Winternitz, *History of Indian Literature*, Vol. II, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd., New Delhi, 1991, p. 165.

৪০. K.R. Norman, *Pali Literature*, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1983, pp. 83-95; Oskar von Hinuber, *A Handbook of pali Literature*, Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1996, pp. 59-63.

৪১. B. C. Law, History of Pali Literature, Vol. I. Indica Books, Vanarasi, 2000, p. 304.

৪২. *বৌদ্ধ সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

৪৩. R. C. Childers, A Dictionary of the Pali Language, Rinsen Book House, Kyoto, 1987, p. 447

৪৪. *ত্রিপিটক পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

৪৫. *বৌদ্ধ সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

৪৬. *ত্রিপিটক পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

৪৮. *ত্রিপিটক পরিচিতি*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

৫১. *ত্রিপিটক পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

৫২. *ত্রিপিটক পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

৫৩. *বৌদ্ধ সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০-১।

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

৫৮. *ত্রিপিটক পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।

৫৯. *বৌদ্ধ সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

৬১. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৩৫৬।

৬২. মণীন্দ্রনাথ সমাজদার, *সংস্কৃত-প্রাকৃত-বিহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১০০।

৬৩. সুমন কান্তি বড়ুয়া, *বোধিচর্যাবতার গ্রন্থে বৌদ্ধ পারমীতত্ত্ব*, পিএইচ.ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫, পৃ. ১৫।

৬৪. জগন্নাথ বড়ুয়া, *বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩৯।

৬৫. *পালি সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯।
৬৬. নলিনী নাথ দাস গুপ্ত, *বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম*, এ মুখার্জী প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮৭।
৬৭. জগন্নাথ বড়ুয়া, *বৌদ্ধ সংস্কৃতি সাহিত্যের ইতিহাস*, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৪২।
৬৮. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সম্পা.), *বৌদ্ধ গান ও দোহা*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৩৩।
৬৯. *বৌদ্ধ গান ও দোহা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।
৭০. *বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।
৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।
৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।
৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।
৭৪. জগন্নাথ বড়ুয়া, *মহাকাব্য ও মহাকবি অশ্বঘোষের কাব্যদর্শ*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯. পৃ. ১০৫।
৭৫. *বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬।
৭৬. প্রসুন বসু (সম্পা.), *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার*, ৯ম খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১১।
৭৭. *বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।
৭৮. *বৌদ্ধ সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২।
৭৯. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যের ইতিহাস,* ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৩৫৭।
৮০. *বৌদ্ধ সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২।
৮১. *পালি সাহিত্যের ইতিহাস,* ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭।
৮২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *রচনা সংগ্রহ তৃতীয় খণ্ড*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৩৪৭।
৮৩. *বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫-২৩৬।
৮৪. David. J. Kalupahana (trans). *Mulamadyamakakarika of Nagarjuna*, Motilal Banarsidass, Delhi 1991, p. 339.
৮৫. *বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮।
৮৬. *বৌদ্ধ সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪।
৮৭. *বৌদ্ধ সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪।
৮৮. *বৌদ্ধ সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬।
৮৯. *বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩।
৯০. *বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪।
৯১. *বৌদ্ধ সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪।
৯২. *পালি ভাষার ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।
৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।
৯৪. *বৌদ্ধ সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।
৯৫. *পালি ভাষার ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।
৯৬. *বৌদ্ধ সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।
৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।
৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।
৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।
১০০. দিলীপ বড়ুয়া ও বিমান চন্দ্র বড়ুয়া (অনু. সম্পা.), *সদ্ধম্ম-সংগহো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা*, পৃ. ১৩৮।
১০১. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, *গন্ধবংস*, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১৪-২৬।

১০২. *বৌদ্ধ সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

১০৪. শান্টু বড়ুয়া, *ঐতিহাসিক পালি বংশ সাহিত্য সমীক্ষা, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১৫।*

১০৫. *বৌদ্ধ সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪-১৩৫।

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

১০৭. *গন্ধবংস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

১০৮. *ঐতিহাসিক পালি বংস সাহিত্য সমীক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।*

১০৯. B. C. Law, *A History of Pali Literature*, Rekha Printers Pvt. Ltd, New Delhi, 2000, p. 569.

১১০. Ed.B.c. Law, *Thupavamsakaya*, Pali Text Society, London, 1935.tr. B.C. Law, *the Legend of the topes*, Calcutta 1945. ed. And tr. N.A. JAYAWICKRAMA, SBB London, 1971; সাধনকমল চৌধুরী, *থুপবংশ*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫।

১১১. *ঐতিহাসিক পালি বংস সাহিত্য সমীক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।*

১১২. Professor Minayeff (ed), *Ganadhavamsa*, Journal of the pali Text Society, P.T.S. London, vol.2, 1986, pp. 54; *ঐতিহাসিক পালি বংস সাহিত্য সমীক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।*

১১৩. Asha Das, *The Glimpses of Pali Literature*, Punthi Pustak, Calcutta, 2000, p. 9; *ঐতিহাসিক পালি বংস সাহিত্য সমীক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।*

১১৪. *ঐতিহাসিক পালি বংস সাহিত্য সমীক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।*

১১৫. *বৌদ্ধ সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

১১৬. *বৌদ্ধ সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬-১৪৭।

১১৭. *পালি ভাষার ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

১১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

১১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

১২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

১২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

১২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিতে বুদ্ধ

রবীন্দ্রনাথের পূর্বানুসারীরা বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মকে যেভাবে দেখেছেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজের মন বুদ্ধ ও তার ধর্ম দর্শনের প্রতি মনোযোগ বেড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের পূর্বেও বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের মহিমাকে অনেকটি অবলোকন করেছেন তাঁদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সাধু অঘোরনাথ, রমেশচন্দ্র দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিবেকানন্দ-প্রমুখ মনীষীদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও নবীনচন্দ্র সেন তাঁদের কাব্য ও নাটকে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছেন। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে যাঁরা বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের আলোচনা করেছেন, তাঁরা এর প্রভাব থেকে বের হতে পারেনি। সনাতনী ধর্মে বৌদ্ধমতের উপর ব্রাহ্মণ্যমত আরোপ করে একটা সমন্বয় সাধনেরও উদ্যোগ গ্রহণ করে। বুদ্ধ নিজেকে কখনও অবতার হিসেবে দাবি করেননি বরঞ্চ তিনি অবতারবাদের অনেক ঊর্ধ্বে। পবিত্র গীতা গ্রন্থে বুদ্ধ ভগবানরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।[১] আর বুদ্ধ বলেন, এটাই আমার শেষ জন্ম, আমি আর জন্মগ্রহণ করব না। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে উপলব্ধি করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানবরুপে।[২]

দীপংকর বুদ্ধ সুমেধ তাপসকে বলেছেন-কুম্ভ যেমন নিম্নমুখী করলে সমস্ত জল পড়ে যায়, কুম্ভ সামান্য জলও প্রত্যাহরণ করে না,সেইরুপ তুমিও ধন-যশ-পুত্রকন্যা এমন কি নিজ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিও যাগকদিগের ইচ্ছানুরুপ দান করে অনাগত কালে বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধ হতে পারবে।[৩] ভারতীয় সনাতনী মতাদর্শরা বুদ্ধকে অবতার হিসেবে জানেন, সেই রীতি অনেকটা বাংলাসাহিত্যেও দেখা যায়। তাঁর প্রমাণ গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচিত 'বুদ্ধদেবড়োচিত' নাটক ও নবীনচন্দ্র সেনের রচিত 'অমিতাভ' কাব্য। গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকের শুরুতে মীন, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি অবতারের পর বুদ্ধ-অবতারের আবির্ভাব; এ কথা উল্লেখ করেছেন। নবীনচন্দ্র সেন *'অমিতাভ'* কাব্যে উল্লেখ করেছেন বুদ্ধ অবতারের রূপ ধারণ করে লীলা করতে এসেছেন।

যাও দেব। লীলা শেষ। এসেছিলে তুমি
একবার যমুনার তীরে পুণ্যবতী,
দেখিয়াছি সেই লীলা কোমল কঠোর!
আসিলে আবার তুমি কপিলনগরে
শৈলপতি হিমাদ্রির পুণ্য পাদমূলে
দেখিলাম এই লীলা আত্মবিসর্জন,
রাজপুত্র মহাযোগী।[৪]

বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অন্তর্গত হিসেবে প্রয়াসের চেষ্টা এবং প্রমাণ করতে হবে যে, বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম হতে আলাদা কোনো সত্ত্বা নয় বরং এ ধর্মের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকটা সেই প্রভাব লক্ষ করেন। কিন্তু ব্যতিক্রম ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বলেছেন, বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অন্য ধর্মের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা আছে। এখানেই সত্যেন্দ্রনাথের বৌদ্ধধর্ম আলোচনার সার্থকতা। 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের উপকারের কথা অপকঠে স্বীকার সাথে সাথে সতীশচন্দ্র প্রণীত 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে লিখেছেন-'সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রণীত বুদ্ধদেব হতে আমি অনেক সাহায্য পেয়েছি।'[৫]

রমেশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীগণের দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম আসলে হিন্দুধর্মেরই অন্তর্গত। রমেশচন্দ্র স্পষ্টই বলেন– 'The main doctrines of Buddhism are old Hindu doctrines adapted to a new system – old wine put in new bottles'.[৬]

অর্থাৎ, নতুন পাত্রে পুরাতন পানীয় রাখার ন্যায় বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্বগুলো সনাতন হিন্দুধর্ম হতে সংগৃহীত। আমেরিকার ডেট্রয়েটে ভাষণে বিবেকানন্দ বলেন যে, প্রাশ্চাত্যের অধিবাসীগণ বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মকে দুটি পৃথক ধর্ম বলে ভুল করেন। এভাবে তিনি ভাষণে ইঙ্গিত করেছেন। তবে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই একটি সম্প্রদায়বিশেষ। তিনি আমেরিকার প্রসিদ্ধ শিকাগো বক্তৃতায়ও বলেছেন যে, বুদ্ধ কোনো নতুন মত প্রচার করতে আসেননি, যিশুর ন্যায় তিনি পূর্ণ করতে এসেছিলেন। হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতিই হলো বৌদ্ধধর্ম।[৭]

এদের দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম একই সূত্রে গাঁথা। এ প্রসঙ্গে সাধু অঘোরনাথ রচিত *'শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব'* গ্রন্থখানি প্রমাণ দেয়। বাংলাসাহিত্যেও সাধু অঘোরনাথ বৌদ্ধধর্মকে নিয়ে আলোচনার প্রভাব দেখা যায়। সাধু অঘোরনাথ *'ললিতবিস্তর'* গ্রন্থে নির্বাণতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন;

> *বুদ্ধদেবের এই উক্তিই নির্বাণের পরমতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিতেছে। তিনি যে সগুণ নির্গুণের অতীত এবং নির্বিকার পুরুষে একাকার হইয়া পরম সমাধি ও সম্বোধি লাভ করিয়া শান্ত ও নিষ্কলঙ্ক হইয়াছিলেন, তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল*[৮]।

এ প্রসঙ্গে আরেকজনের নাম উল্লেখ্য যে, মহেশচন্দ্র ঘোষ (১৮৬৮-১৯৩০)। যাঁর সাথে বৌদ্ধ দর্শনের আলোচনায় বিশেষ সখ্য লক্ষ করা যায়। এর প্রমাণ বিংশ শতকে প্রবাসী পত্রিকায় বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সাথে মহেশচন্দ্রের সাহিত্য রচনার সখ্য পরিচয় পাওয়া যায়।[৯] 'সম্যক সমাধি ও ব্রহ্মবিহার' প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, গৌতমের আত্মবাদ ও অনাত্মবাদ আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, তিনি যাহা বিশ্বাস করিতেন তাহা (আমাদের ভাষায়) আত্মবাদই।[১০] রবীন্দ্রনাথের

দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পূর্বগামী বৌদ্ধশাস্ত্র বিষয়ে পণ্ডিতদের বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম আদর্শিক চিন্তাধারার একটি বিশেষ পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এটি ছিল রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের পূর্বগামীদের দৃষ্টিতে বুদ্ধকে অবতার হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা মনে করেননি। তিনি বুদ্ধকে মহামানব রূপেই পূজার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন এবং এই মানবীয় গুণমহিমার প্রতিই তিনি অন্তরের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধের মহান আদর্শকে যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন। হিন্দু জমিদারী পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হলেও ব্রাহ্মণ্য সমাজের ধ্যান-ধারণা তাকে বেশি প্রভাবিত করতে পারেনি। বরং বুদ্ধের আদর্শে আদর্শিত হয়েছেন। তিনি প্রধানত ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে বৌদ্ধধর্মকে আলোচনা করেছেন। তা ছাড়া বৌদ্ধধর্ম যে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত, রবীন্দ্রনাথ এমন কথাও বলেননি। এখানেই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য।

বুদ্ধের আদর্শকে রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে আকর্ষণ করেছিলেন, তেমন আর কেউ করতে পারেননি। বুদ্ধই শ্রেষ্ঠ মহামানব। বুদ্ধের আদর্শ মহিমাই বিশ্বকে জয় করেছেন। পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে কত সাম্রাজ্যের উত্থানপতন হয়েছে, কিন্তু মানবহৃদয়ে শান্তির বার্তা প্রতিষ্ঠায় তেমন কেউ আড়োলন সৃষ্টি করতে পারেননি। একমাত্র বুদ্ধই শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইতিহাসে বিরল। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> *'কেবল পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রকাশ তারই, সকল দেশের সকল কালের সকল মানুষকে যিনি আপনার মধ্যে অধিকার করেছেন, যার চেতনা খন্ডিত হয়নি। রাষ্ট্রগত জাতিগত দেশকালের কোনো অভ্যস্ত সীমানায়'।*[১১]

মনুষ্যত্বে পূর্ণতা লাভে বুদ্ধের চরিত্রমহিমাই দ্বীপ্তমান আলোকরশ্মির। বুদ্ধের মৈত্রীর বাণী ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনের মূলমন্ত্র। এই মহামানবের বাণীকেই তিনি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তুলে ধরেছেন। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন :

> *'ভারতবর্ষের যথার্থ সাধনাকে বিশ্বজগতের কাছে জয়ী করে তুলেছেন প্রাচীনকালের বুদ্ধ এবং অশোক, আর আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ। তা ছাড়া আর তো কাউকে দেখিনে যিনি বিশ্বজগতের কলকোলাহলের ঊর্ধ্বে ভারতীয় সাধনার মৈত্রী ও প্রেমের বাণীকে সগৌরবে তুলে ধরতে পেরেছেন। দিগ বিজয়ী গ্রীকবীর আলেকজান্ডারের অস্ত্রঝনৎকারের যথাযোগ্য ভারতীয় প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন রাজর্ষি অশোক, দিগ বিজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়ের দ্বারা, রাজ্যাধিকারের বদলে মর্মাধিকারের দ্বারা। তৎকালীন জগতের যে-যে স্থলে আলেকজান্ডারের সেনাবাহিনী পশুবলের বিজয়বার্তা ঘোষণা করেছিল, প্রিয়দর্শী অশোকের শান্তিবাহিনী ঠিক সে-সব স্থলেই গৌতমবুদ্ধ-প্রবর্তিত ধর্মচক্র চালিত করে নিনাদিত করে তুলেছিল বিশ্বমৈত্রীর জয়ঘোষণা। আর, আধুনিককালে একাজ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি একাই বুদ্ধের বাণী ও অশোকের প্রচার, এই উভয় দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। তফাত এই যে, বুদ্ধ বা অশোক স্বয়ং বিশ্বজগতে বহির্গত হন নি মৈত্রীর পতাকা বহন করে; রবীন্দ্রনাথকে কিন্তু তাই করতে হয়েছে'।*[১২]

রবীন্দ্রনাথ মানবীয় আদর্শের সবগুণ বুদ্ধের কাছ থেকে পেয়েছেন। বুদ্ধকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে অভিহিত করেছেন। বুদ্ধজীবনাদর্শই তাঁর জীবন ও সাহিত্যকে সমানভাবে উজ্জ্বল করেছে। বুদ্ধের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশে, ভারতীয় সাহিত্যে জগতে তা বিরল। কলকাতা ধর্মরাজিক চৈত্যবিহারে ১৩৪২ সালের ৪ জ্যৈষ্ঠ বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে ভাষণের শুরুতে তিনি বলেন;

> *আমি যাকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তার জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি। এ কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলঙ্কার নয়, একান্তে নিভৃতে যা তাকে বার-বার সমর্পণ করেছি সেই অর্ঘ্যই আজ এখানে উৎসর্গ করি।*[১৩]

বুদ্ধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল রবীন্দ্রনাথের। তাই জীবনসন্ধিক্ষণে এসেও রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধকে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন;

কাল প্রাতে মোর জন্মদিনে
এ শৈল-আতিথ্যবাসে
বুদ্ধের নেপালী ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনে।
ভূতলে আসন পাতি
বুদ্ধের বন্দনামন্ত্র শুনাইল আমার কল্যাণে
গ্রহণ করিনু সেই বাণী
এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব
সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন,
মানুষের জন্মক্ষণ হতে
নারায়ণী এ ধরণী
যার আবির্ভাব লাগি অপেক্ষা করেছে বহু যুগ,
যাহাতে প্রত্যক্ষ হল ধরায় সৃষ্টির অভিপ্রায়,
শুভক্ষণে পুণ্যমন্ত্রে
তাহারে স্মরণ করি জানিলাম মনে–
প্রবেশি মানবলোকে আশি বর্ষ আগে
এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও।[১৪]

রবীন্দ্রচেতনায় অনুপ্রেরণার ফসল তীর্থভূমি বুদ্ধগয়া, সারনাথ ভ্রমণে। 'সমালোচনা' (১৮৮৮) গ্রন্থে তিনি লিখেছেন– আমি একজন বুদ্ধের ভক্ত। বুদ্ধের অস্তিত্বের বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন আমি সেই তীর্থে যাই, যেখানে বুদ্ধের দন্ত রক্ষিত আছে, সেই শিলা দেখি যাহার উপর বুদ্ধের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে,

তখন আমি কতখানি প্রাপ্ত হই! যখন দেখি, ফুটন্ত, ছুটন্ত বর্তমান স্রোতের উপর পুরাতন কালের একটি প্রাচীন জীর্ণ অবশেষ নিশ্চলভাবে বসিয়া– অতীতের দিকে অনিমেষনেত্রে চাহিয়া আছে, অতীতের দিকে অঙ্গলি নির্দেশ করিতেছে, তখন এমন হৃদয়হীন পাষাণ কে আছে যে মুহূর্তের জন্য থামিয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া সেই মহা অতীতের দিকে চাহিয়া না দেখে![১৫]

রবীন্দ্রনাথের জীবনে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য অনেকবার বুদ্ধগয়ায় গমন করে বুদ্ধের পুণ্যস্পর্শ পুলকিত হয়েছেন। বুদ্ধগয়ার মন্দিরদর্শনে কবিচিত্তে ভাবাবেগ সৃষ্টি হলো এবং বলেন– '*যার চরণস্পর্শে বহুন্ধরা একদিন পবিত্র হয়েছিল তিনি যেদিন সশরীরে এই গয়াতে ভ্রমণ করেছিলেন, সেদিন কেন আমি জন্মাই নি, সমস্ত শরীর মন দিয়ে। প্রত্যক্ষ তার পুণ্যপ্রভাব অনুভব করি নি?*'[১৬] *ভারতে বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে কবির প্রণতি নয় শুধু থাইল্যান্ড, বার্মা, জাভায় গিয়েও বুদ্ধের স্মৃতি চিহ্নসমূহ দেখে শ্রদ্ধায় পুলকিত হয়েছেন। বোরোবুদুরের পাষাণস্তুপের সামনে গিয়ে কবির মনে ধ্বনিত হয়েছে*– 'বুদ্ধের শরণ লইলাম'। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ভগবান বুদ্ধ রাজসম্পদ ত্যাগ করে তপস্যা করতে বসেছিলেন শুধুমাত্র সকল মানুষের দুঃখমোচনের সঙ্কল্প নিয়ে।[১৭]

বুদ্ধের প্রতি কবির হৃদয়ের প্রণতি এ চরণটিই প্রমাণ করে। বুদ্ধের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম শ্রদ্ধা 'নটীর পূজা'য় দাসী শ্রীমতীর নৃত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে;

আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নম
তোমায় স্মরি, হে নিরুপম,
নৃত্যরসে চিত্ত মম
উছল হয়ে বাজে।
আমার সকল দেহের আকুল রবে
মন্ত্রহারা তোমার স্তবে
ডাহিনে বামে ছন্দ নামে
নব জনমের মাঝে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সংগীতে বিরাজে।
এ কী- পরম ব্যথায় পরাণ কাঁপায়
কাঁপন বক্ষে লাগে
শান্তি সাগরে ঢেউ খেলে যায়
সুন্দর তায় জাগে।
আমার সব চেতনা সব বেদনা

রচিল এ যে কী আরাধনা,
তোমার পায়ে মোর সাধনা
মরে না যেন লাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সংগীতে বিরাজে।[১৮]

আবেগীয় গীতিনৃত্যে প্রকাশে কবির হৃদয়াবেগ চেতনার আকুলতা যেন বুদ্ধের চরণে প্রণতির বহিঃপ্রকাশ। তাঁর এই চেতনাবোধ থেকে 'আরাধনা' সংগীত রচনা করেছেন। দাসী শ্রীমতির সাথে কবিও সংগীতের তালেতালে বন্দনায় নিয়োজিত ছিলেন।

বৈশাখী পূর্ণিমা ও আষাঢ়ী পূর্ণিমা এই তিথি দুটির গুরুত্ব রবীন্দ্রনাথের জীবনে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় মহামানব বুদ্ধের আবির্ভাব, বুদ্ধত্বলাভ ও মহাপরি নির্বাণের তিথি। আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধ সারনাথের ইসিপতন মৃগদাবে সর্বপ্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করেন। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ধর্মচক্রপ্রবর্তন তিথি যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে।[১৯]

এই প্রসঙ্গে বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে রচিত 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি---' গানটি স্মরণীয়। আজকের এ অশান্ত বিশ্বে হিংসা, হানাহানি, লোভ ও সংঘাতময় দিনে শান্তিকামী মানবতার ক্রন্দনধ্বনি যেন সূরেসূরে ধ্বনিত হয়েছে–

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোরকুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
কর' ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন' অমৃতবাণী,
বিকশিত কর' প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য।
ক্রন্দনময় নিখিলহৃদয় তাপদহনদীপ্ত,
বিষয় বিষবিকারজীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষগ্লানি,
তব মঙ্গলশঙ্খ আন' তব দক্ষিণ পাণি–
তব শুভসংগীত রাগ, তব সুন্দর ছন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তড়্পুণ্য,
করুণাধন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য[২০]

জগতে বুদ্ধ শুধু করুণার আধার নন, হিংসা বিদ্বেষ গ্লানি থেকে মানুষকে মুক্তিদাতা এবং তাঁর দক্ষিণ হাতের মঙ্গলাস্পর্শে সকল দুঃখ প্রশমিত হবে, জগত প্রজ্ঞাময় আলোর দিশারী এটিই কবির দৃঢ় বিশ্বাস। 'সিয়াম' কবিতায় কবি অহিংসার জয়গান করেছেন;

'এক ধর্ম, এক সংঘ, এক মহাগুরুর শক্তিতে
সে বাণীর সৃষ্টি ক্রিয়া নাহি জানে শেষ
নব যুগ-যাত্রাপথে দিবে
নিত্য নূতন উদ্দেশ।'

কবি অহিংসা, ক্ষমা, ত্যাগকে হিংসা-বিদ্বেষের উপর স্থান দিয়েছেন এবং এক্ষেত্রে বুদ্ধবাণীকে পাথেয় হিসেবে নিয়েছেন। কবি মহাসংকটের দিনে বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধের উদ্দেশ্যে আরো একটি গান রচনা করেন।

গানটি হলো–

সকল কলুষতামস হর',
জয় হোক তব জয়।
অমৃতবারি সিঞ্চন কর'
নিখিলভূবনময়।
মহাশান্তি, মহাক্ষেম,
মহাপুণ্য, মহাপ্রেম!
জ্ঞানসূর্য-উদয়-ভাতি
ধ্বংস করুক তিমিররাতি,
দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি
অপগত কর' ভয়।...
মোহমলিন অতিদুদিন
শঙ্কিত-চিত পান্থ
জটিল-গহন-পথসংকট
সংশয়-উদ্ভ্রান্ত।
করুণাময়, মাগি শরণ
দুর্গতিভয় করহ হরণ,
দাও দুঃখবন্ধতরণ
মুক্তির পরিচয়।[২১]

রবীন্দ্রনাথ 'সকলকলুষতামসহর' কথাটি বুদ্ধের প্রতি মমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। বুদ্ধ একদিকে যেমন বিশ্বে করুণাদর্শে বিভূষিত অন্যদিকে তিনি সকল কলুষতা বিদূরিত করে অমৃতময় ভূবনে প্রস্ফুটিত করেন। কবি যে আবেগময় করুণার দ্বীপ্তকণ্ঠে বুদ্ধকে শরণ ও বুদ্ধের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন, যার প্রমাণ অজন্তা-ইলোরার সাধক-শিল্পীদের শৈল্পিকতা পাথরের গায়ে বুদ্ধের অবয়ব মূর্তি স্থাপন করেছিলেন, সে চিত্রও যেন কবির কাছে ম্লান হয়ে যায়;

বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে
নিরঞ্জন আনন্দমুরতি।
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে স্ফুরিছে অধর-'পরে
করুণার সুধাহাস্যজ্যোতি।
সুদাস রহিল চাহি- নয়নে নিমেষ নাহি,
মুখে তার বাক্য নাহি সরে।[২২]

এই লাইনগুলো অনুধাবন করলে মনও নির্বাক বিস্ময়ে নিস্তব্ধ হয়ে দেখে শুধু সেই আনন্দসিক্ত অশ্রু।

নির্বাক সে সভাঘরে ব্যথিত নগরী-'পরে
বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারাসম রহে ফুটি।[২৩]

থাইল্যান্ড ভ্রমণে রবীন্দ্রচেতনায় বুদ্ধের করুণাঘন রূপটি ভেসে ওঠে।–

পদ্মাসন আছে স্থির,
ভগবান বুদ্ধ সেথা সমাসীন
চিরদিন–
মৌন যাঁর শান্তি অন্তহারা,
বাণী যাঁর সকরুণ সান্ত্বনার ধারা।[২৪]

এ সব বর্ণনায় বুদ্ধদেবের যে অপরূপ চিত্র ফুটে উঠেছে, সৌন্দর্য ও নমনীয়তার সমগ্র বাংলাসাহিত্যে বুদ্ধপ্রশস্তি রচনায় এর তুলনা বিরল। বুদ্ধের অনন্ত করুণার আদর্শ কবির মনে, তাঁর সাহিত্যের বিভিন্নক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন; *'বুদ্ধদেবের করুণা সন্তানবাৎসল্য নহে, দেশানুরাগও নহে- বৎস যেমন গাভী মাতার পূর্ণস্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র অথবা মহৎ কোনো শ্রেণির স্বার্থপ্রবৃত্তি*

সেই করুণাকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না। তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে'।[২৫]

এই করুণাদর্শে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধবাণীতে উল্লেখ করেন–

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরকখে
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।[২৬]

মা যেমন একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করেন তদ্রুপভাবে সব প্রাণীর প্রতিও অপরিমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করতে হবে। সব প্রাণীর প্রতি বাধা, হিংসা, শত্রুহীন হোক। বুদ্ধের করুণার বাতাবরণে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ সহজেই অনুমান করা যায়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যেও নয়, জীবনেও অহিংসা ও করুণার বাণীতে পরিপূর্ণ। এগারো বছরে বয়সে কবি হরিশ মালীর সঙ্গে চীদ সাহেবের কুঠার আঘাতে নিরীহ খরগোশ শাবক দেখে যে গভীর বেদনাহত হয়েছিলেন তা শেষ জীবনেও তিনি ভুলতে পারেননি।[২৭]

এই ক্ষুদ্র প্রাণীর ব্যথাই কবির মনে করুণায় অভিসিক্ত হলেন। এতে প্রমাণ হয় যে, বুদ্ধের করুণাদর্শ রবীন্দ্রনাথকে কতটুকু প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশেষ করে কাব্য, উপন্যাস, নাটক ও সংগীত ধারায় করুণা অজস্র পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের রচিত বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১) ও কালমৃগয়া (১৮৮২) কাব্যনাটিকা গভীর করুণার সঞ্চারে কবির আবেগে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে;

এ কেমন হল মন আমার!
কী ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে পারি নে।
পাষাণহৃদয় গলিল কেন রে!
কেন আজি আঁখিজল দেখা দিল নয়নে।
কী মায়া এ জানে গো,
পাষাণের বাধ এ যে টুটিল,
সব ভেসে গেল গো, সব ভেসে গেল গো-
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবণে॥[২৮]

কবির রচিত 'রাজর্ষি' (১৮৮৬) উপন্যাস এবং 'বিসর্জন' (১৮৯০) নাটকেও অহিংসা ও করুণার স্পর্শ পরিপূর্ণ। দুর্বল জীবের প্রতি মানুষের নৃশংস নিষ্ঠুরতা কবি বেদনায় বিভূষিত হয়েছে;

বুঝিতে পার না জীবজননীর পূজা
জীবরক্ত দিয়ে নহে, ভালোবাসা দিয়ে!

বুঝিতে পার না ভয় যেথা মা সেখানে
নয়, হিংসা যেথা মা সেখানে নাই, রক্ত
যেথা মা'র সেথা অশ্রুজল! ওরে বৎস,
কী করিয়া দেখাব তোদের, কী বেদনা
দেখেছি মায়ের মুখে, কী কাতর দয়া,
কী ভর্ৎসনা অভিমান-ভরা ছলছল নেত্রে তার।
দেখাইতে পারিতাম যদি,
সেই দণ্ডে চিনিতিস আপনার মাকে।
দয়া এল দীনবেশে মন্দিরের দ্বারে,
অশ্রুজলে মুছে দিতে কলঙ্কের দাগ
মা'র সিংহাসন হতে-সেই অপরাধে
মাতা চলে গেল রোষভরে, এই তোরা
করিলি বিচার?[২৯]

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জীব প্রেমাসক্ত থাকলেও শেষ জীবনে নানা প্রতিকূলতার সত্ত্বেও পশুবলির বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। ১৯৩৫ সালে রামচন্দ্র শর্মা রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে কালীঘাটের কালীমন্দিরে পশুবলি বন্ধে অনশন ধর্মঘট করলে রবীন্দ্রনাথ সাহসী যুবককে অভিনন্দিত করেন এবং তার উদ্দেশে এক কবিতাও রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের এ আচরণ রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ মেনে নিতে পারেননি।[৩০]

সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন আপস করেননি। প্রাণীর প্রতি দয়াবশত রবীন্দ্রনাথ অনেকবার নিরামিষ আহারও করেছিলেন। শিলাইদহে বোটে থাকাকালীন কবি একদিন দেখলেন যে, এক বাবুর্চি মুরগি ধরে আনছে। এই দৃশ্য দেখে কবির মনে গভীর বেদনার সঞ্চার হয় তার চিঠিতে প্রকাশ পেয়েছে; '*আমি ফটিককে ডেকে বললুম আমার জন্যে আজ মাংস হবে না। এমন সময় ডাকে বলুর 'পশুপ্রীতি' লেখাটা এসে পৌঁছল, আমি পেয়ে কিছু আশ্চর্য হলুম। আমার তো আর মাংস খেতে রুচি হয় না। আমরা যে কী অন্যায় এবং কী নিষ্ঠুর কাজ করি তা ভেবে দেখি নে বলে মাংস গলাধঃকরণ করতে পারি। আমার বোধ হয় সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম জীবে দয়া। প্রেম হচ্ছে সমস্ত ধর্মের মূল ভিত্তি। জগতে আমা হতে যেন দুঃখের সৃজন না হয়ে সুখের বিস্তার হতে থাকে। আমি তো মনে করেছি আরও একবার নিরামিষ খাওয়া ধরে দেখব।*'[৩১] উল্লেখ্য যে, একসময় রবীন্দ্রনাথের আদেশে শিলাইদহ চরে পাখি মারা নিষেধ ছিল।[৩২]

শান্তিনিকেতনেও রবীন্দ্রনাথের প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ ছিল। মানুষের দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের জন্য বুদ্ধ রাজ্য-সংসার ত্যাগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বুদ্ধই পৃথিবী জয় করেছিলেন, আলেকজাণ্ডার করেননি"।[৩৩] আলেকজাণ্ডার লোভের বশবর্তী হয়ে অস্ত্রের দ্বারা যে ভূখন্ড অধিকার করেছিলেন, তা সত্যিকারের জয় নয়। অস্ত্রবিহীন যুদ্ধ ত্যাগ, প্রেমের দ্বারা যে পৃথিবী জয় করেছিলেন, সেটাই সত্যিকারের জয়। বুদ্ধের অহিংসার বাণী মানুষের শান্তি বিরাজমান। রবীন্দ্রসাহিত্যে এই ত্যাগের আদর্শ উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয়েছে। তাই কবির দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে;

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই;
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই'।[৩৪]

মানুষের লোভ, দ্বেষ, মোহের কারণে যেভাবে মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে যে স্বার্থের সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে, কবি এই ভয়াবহতা তা প্রত্যক্ষ করেছেন। বুদ্ধের অহিংসার বাণীই সকলকে জয় করেছিলেন। কবির অন্তরে গভীর ভরসার সঞ্চার হয়;

হেনকালে জ্বলি উঠে বজ্রাগ্নি-সমান
চিত্তে তাঁর দিব্যমূর্তি, সেই বীর রাজার কুমার
বাসনারে বলি দিয়া বিসর্জিয়া সর্ব আপনার
বর্তমানকাল হতে নিষ্ক্রমিলা নিত্যকাল-মাঝে
অনন্ত তপস্যা বহি মানুষের উদ্ধারের কাজে
অহমিকা-বন্দীশালা হতে।- ভগবান বুদ্ধ তুমি,
নির্দয় এ লোকালয়, এ ক্ষেত্রই তব জন্মভূমি।
ভরসা হারাল যারা, যাহাদের ভেঙেছে বিশ্বাস,
তোমারি করুণাবিত্তে ভরুক তাদের সর্বনাশ,-
আপনারে ভুলে তারা ভুলুক দুর্গতি।- আর যারা
ক্ষীণের নির্ভর ধ্বংস করে, রচে দুর্ভাগ্যের কারা
দুর্বলের মুক্তি রুষি, বোসো তাহাদেরি দুর্গদ্বারে
তপের আসন পাতি; প্রমাদবিহ্বল অহংকারে
পড়ুক সত্যের দৃষ্টি; তাদের নিঃসীম অসম্মান
তর পুণ্য আলোকেতে লভুক নিঃশেষ অবসান।[৩৫]

ত্যাগদ্বীপ্ত মহাপুরুষ বুদ্ধকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্রও বলেছেন–

এসো দানবীর, দাও ত্যাগকঠিন দীক্ষা–
মহাভিক্ষু, লও সবার অহংকারভিক্ষা।[৩৬]

বুদ্ধদেবের ত্যাগের মহিমা রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে। 'কথা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত শ্রেষ্ঠভিক্ষা, মস্তক বিক্রয়, পূজারিণী, মূল্যপ্রাপ্তি, নগরলক্ষ্মী প্রভৃতি কবিতায়ও কবি লেখনীতে প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেছেন;

'যে ত্যাগের আবেগে নারী আপনার লজ্জা ভুলিয়া একমাত্র পরিধেয় বসন প্রভু বুদ্ধের নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে, আপনার ভোগের উৎসৃষ্ট অংশ হইতে কিছু দেওয়াকে ত্যাগ মনে করে নাই, যে ত্যাগ নৃপতিকে ভিখারীর বেশ পরিধান করাইয়া দীনতম সন্ন্যাসী সাজাইয়াছে, পূজারিণী রাজদন্ডের ভয়কে তুচ্ছ করিয়া পূজার জন্য প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে সেই সকল ত্যাগের কাহিনীই ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের ভিতর হইতে রবীন্দ্রনাথ জাগাইয়া তুলিলেন'।[৩৭]

বুদ্ধের এই ত্যাগের চিত্র রবীন্দ্রচেতনাকে ত্যাগের অনুপ্রেরণা দান করেছে এবং রবীন্দ্রসাহিত্যও সেই আদর্শের জয়গানে মুখর। সেজন্য ভারতের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের এত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'প্রতিনিধি' কবিতায় রামদাস স্বামীর উক্তির মধ্য দিয়ে রাজসন্ন্যাসীর আদর্শ সুন্দররূপে ব্যক্ত করেছেন;

তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন।
পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম,
রাজ্য লয়ের রবে রাজ্যহীন।
বৎস, তবে এই লহো মোর আশীর্বাদ সহ
আমার গেরুয়া গাত্রবাস
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো
কহিলেন গুরু রামদাস।[৩৮]

রাজর্ষি, বিসর্জন এবং শারদোৎসব নাটকে নৃপতি গোবিন্দমাণিক্য ও বিজয়াদিত্য এই দুজনই কবির আদর্শে সৃষ্টি। এ প্রসঙ্গে 'মস্তকবিক্রয়' কবিতার কবি কোশল রাজার কথা প্রশংসনীয়। ত্যাগময়তা সবাইকে জয়ের পূর্ণতার প্রকাশ পায়, এ ভাবটি বিজয়াদিত্যের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক অপূর্ব ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছেন–

আমি অনেক দিন ভেবেছি জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন। কিছুই ভেবে পাইনি। আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি-জগৎ আনন্দের ঋত শোধ করছে। বড়ো সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ করে

করছে। সেইজন্যেই ধানের খেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে, বেতসিনীর নির্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেইজন্যেই এত সৌন্দর্য।[৩৯]

বুদ্ধের অমিয়বাণী মূলত এই বিশ্ব মৈত্রীর সুরে যেভাবে মানককল্যাণে জাগরিত হয়েছে, তা ইতিহাসে বিরল। রবীন্দ্রনাথের জীবন এবং বাণীতেও এই বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সাহিত্যকর্মে বুদ্ধের আদর্শের সাক্ষ্য বহন করে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বশান্তির কল্যাণবার্তা নিয়ে পরিভ্রমণ করেছেন। কবিগুরুকে স্মরণ করে দেয় বুদ্ধের মৈত্রীবাণী 'চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' হে ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতের জন্য বহুজনের সুখের জন্য তোমরা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়। বুদ্ধের এই আদর্শ রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রভাবিত করেছে। বুদ্ধের এই বিশ্বমৈত্রী পৃথিবীর সকল মানুষকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমের বীণার সুরে আহ্বান জানিয়েছেন;

মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র-করা
তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে।[৪০]

কবির নিজস্ব সৃষ্ট বিশ্ব মানবতার শিক্ষাদর্শ বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মূলে রবীন্দ্রনাথের মনে সেই আদর্শ জাগ্রত ছিল। ঐক্যসাধনই বিশ্বমৈত্রীর মূল লক্ষ্য। কবি উপলব্ধি করেছেন;

বুদ্ধদেব জাতিবর্ণ ও শাস্ত্রের সমস্ত ভাগবিভাগ অতিক্রম করে বিশ্বমৈত্রী প্রচার করেছিলেন। এই বিশ্বমৈত্রী যে মুক্তি বহন করে সে হচ্ছে অনৈক্য- বোধ থেকে মুক্তি।[৪১] রবীন্দ্রনাথ ঐক্যর কথা প্রতিটি বিভাগেই দৃষ্টিগোচর করেছেন। সভ্যতার যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন এক মহান ঐক্যের সাধনা। কবির অন্তরে ভারতবর্ষের এই সত্য স্বরূপটি সুস্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে; *'ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন সে উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা-বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা'।*[৪২]
কবি অমিয় জীবনের ধারা আরো দেখেছেন এভাবে;

'হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওঙ্কারধ্বনি

হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রনরনি।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া'।[৪৩]

ভারত ইতিহাসে ঐক্যের বিকাশ সাধনে বুদ্ধের মৈত্রীর বাণী বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে, যা পৃথিবীর ইতিহাসে এর পূর্বে বা পরে ঐক্যের বন্ধন আর দেখা যায়নি। এই ঐক্যবন্ধনের মূলে রয়েছে বুদ্ধের মহান কল্যাণ প্রেরণা। থাইল্যান্ড ভ্রমণে গিয়ে কবি একথা গভীর আবেগের সাথে স্মরণ করেছেন;

সে মন্ত্র ভারতী
দিল অস্খলিত গতি
কত শত শতাব্দীর সংসারযাত্রারে
শুভ আকর্ষণে বাঁধি তারে
এক ধ্রুবকেন্দ্র-সাথে
চরম মুক্তির সাধনাতে,
সর্বজনগণে তব এক করি একাগ্র ভক্তিতে–
এক ধর্ম, এক সংঘ, এক মহাগুরুর শক্তিতে।[৪৪]

বৌদ্ধধর্ম অধ্যুষিত দেশসমূহে ভ্রমণে কবির কর্মজীবনকে ঐক্যেসাধনে শক্তি জুগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক প্রজ্ঞার আলোকে এ সত্য প্রকাশিত হয়েছে; *আপনাকে আপনাতেই যে বদ্ধ করে সে থাকে লুপ্ত, আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে সেই হয় প্রকাশিত। মনুষ্যত্বের এই প্রকাশ ও প্রচ্ছন্নতার একটা মস্ত দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। বুদ্ধদেব মৈত্রীবুদ্ধিতে সকল মানুষকে এক দেখেছিলেন, তার সেই ঐক্যতত্ত্ব চীনকে অমৃত দান করেছিল। আর, যে বণিক লোভের প্রেরণায় চীনে এল এই ঐক্যতত্ত্বকে সে মানলে না; সে অকুণ্ঠিতচিত্তে চীনকে মৃত্যুদান করেছে, কামান দিয়ে ঠেসে ঠেসে তাকে আফিম গিলিয়েছে। মানুষ কিসে প্রকাশ পেয়েছে আর কিসে প্রচ্ছন্ন হয়েছে, এর চেয়ে স্পষ্ট করে ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায় নি।*[৪৫]

ভারতবর্ষ বুদ্ধ ঐক্যতত্ত্ব দান করলেও; কিন্তু সেই ভাবধারা আজ ভারতবর্ষে অনেকটা বিলীনপ্রায়। এই অনৈক্যের মূলে প্রধানত দুই সামাজিক সমস্যা জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা। ভারতবর্ষে মানুষের প্রতি মানুষের আচরণে যে নিষ্ঠুরতা, অবজ্ঞা ও ঘৃণা, মানবিক মূল্যবোধে বারবার আঘাত তা রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনেও কবি অনেকবার এরকম ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জমিদার বংশের লোক। তিনি সেরেস্তায় গিয়ে দেখেছেন, ব্রাহ্মণ ম্যানেজার যে তক্তপোশে গদিতে বসে দরবার করেন সেখানে জাজিম

তোলা স্থানটি মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট, আর জাজিমের উপর হিন্দুদের স্থান।[৪৬] দীনবন্ধু এন্ড্রুজের সাথে মালাবারে ভ্রমণকালীন দেখেছেন, টিপ্পা সমাজভুক্ত একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক ব্রাহ্মণপল্লীতে পা বাড়াতেও সাহস করেন না।[৪৭] এছাড়া আরেকজন বিদেশি রুগ্‌ন পথিকের কথা রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার উল্লেখ করেছেন।[৪৮] শীতের সময় পীড়িত বিদেশি মানুষ তিন দিন ধরে নদীর পাশে পড়ে আছে দেখেও পাশ দিয়ে শত শত পুণ্যার্থী শুচি হতে জলে ডুব দিচ্ছে, কিন্তু এই অসহায় পীড়িত মানুষকে ছুঁলে অশুচি হবে বিধায় কেউ স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। কবি দৃশ্যটি দেখে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, 'সেই অজ্ঞাতকুলশীল পীড়িত মানুষের সামান্যমাত্র সেবা করলে তারা অশুচি হতো, শুচি হবে জলে ডুব দিয়ে।'[৪৯]

তাই কবি দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করে বলতে চেয়েছেন; '*মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতেই হইবে*'।[৫০]

কবি এ প্রসঙ্গে আরোও বলেন;

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।[৫১]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, একসময়ে রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশতাবিরোধী আন্দোলনকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করেছিলেন।[৫২]

জাতিভেদ ও অস্পৃতার অভিশাপ মানুষকে অন্ধকার জগতে নিয়ে যায়। বর্ণ-বৈষম্যেই মানুষের মুক্তির অন্তরায়। বুদ্ধই সে বৈষম্যর জাতাকল থেকে মুক্তির ঘোষণা করেছেন। মানবতার মূল্যবোধ, সাম্যের গানে কবি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাই বলেন;

'রাজার বংশে দাসী জন্মায় অসংখ্য
আমি সে দাসী নই।
দ্বিজের বংশে চন্ডাল কত আছে
আমি নই চন্ডালী'।[৫২]

প্রকৃতি চণ্ডাল কন্যা অস্পৃশ্যা কর্মে নয়, জন্মের কারণে। বুদ্ধ মনে করেন, জন্মগত শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণ করে না, স্বীয় কর্মফলে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন হয়। আমাদের দেশে আজ মানুষের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার অন্তরায় থেকে মুক্তির জন্য বুদ্ধের মৈত্রীর বাণী প্রয়োজন। তাই কবি মনে করেন; *বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে, অপবিত্র ভেদবুদ্ধির*

নিষ্ঠুর মূঢ়তা ধর্মের নামে আজ রক্তে পঙ্কিল করে তুলেছে এই ধরাতল; পরস্পর হিংসার চেয়ে সাংঘাতিক পরস্পর ঘৃণায় মানুষ এখানে পদে পদে অপমানিত। সর্বজীবে মৈত্রীকে যিনি মুক্তির পথ বলে ঘোষণা করেছিলেন সেই তাঁরই বাণীকে আজ উৎকণ্ঠিত হয়ে কামনা করি এই ভ্রাতৃবিদ্বেষকলুষিত হতভাগ্য দেশে। পূজার বেদীতে আবির্ভূত হোন মানবশ্রেষ্ঠ, মানবের শ্রেষ্ঠতাকে উদ্ধার করবার জন্যে। ভগবান বুদ্ধ একদিন রাজসম্পদ ত্যাগ করে তপস্যা করতে বসেছিলেন। সে তপস্যা সকল মানুষের দুঃখমোচনের সংকল্প নিয়ে। এই তপস্যার মধ্যে কি অধিকারভেদ ছিল? কেউ ছিল কি ম্লেচ্ছ? কেউ ছিল কি অনার্য? তিনি তার সব-কিছু ত্যাগ করেছিলেন দীনতম মূর্খতম মানুষেরও জন্যে। তার সেই তপস্যার মধ্যে ছিল নির্বিচারে সকল দেশের সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা। তাঁর সেই এত বড়ো তপস্যা আজ কি ভারতবর্ষ থেকে বিলীন হবে?[৫৩]

রবীন্দ্রনাথ সমতার দৃষ্টিতে দেখেছেন সবাইকে, তাঁর মধ্যে ধনী-গরীব, শুচি-অশুচি, ব্রাহ্মণ-শুদ্র ছিল না কোনো বৈষম্য। তাই আমাদের জাতিভেদ ভূলে একই সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনকে অশুচি বলতেও দ্বিধা করেননি।

এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার
এসো হে পতিত, করো অপনীত সব অপমানভার।[৫৪]

কবি দেশের প্রতি ধনী-গরিব, শুচি-অশুচি, ব্রাহ্মণ-শুদ্র নির্বিশেষে সকলকে মমত্ববোধ জাগ্রত করার আহ্বান করেছেন। সবার স্পর্শে পবিত্র তীর্থভূমি ভারতে গৌরব সুদৃঢ় করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে কল্যাণে সুন্দর রূপটির মূলে নির্ভরতা ও আশ্রয়স্থল ছিল বুদ্ধ। যখনই কোনো অশান্তি বা অমঙ্গল দেখা দিয়েছে, তখন তিনি বুদ্ধকে স্মরণ করেছেন। বুদ্ধের আদর্শ বাণীতে ভারতবর্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে তা নয়, সেই মহিমা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িছে পড়েছে। তাই কবি বিশ্বাস করেন, বুদ্ধের মৈত্রীর বাণীতে নবভারত রচনায় আবার নতুন প্রাণসঞ্চার করবে। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন;

‘চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু
আয়ু করো দান।
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক প্রাণবান।
খুলে যাক রুদ্ধদ্বার, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বনি
ভারত-অঙ্গনতলে আজি তব নব আগমনী,
অমেয় প্রেমের বার্তা শত কণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি–
এনে দিক অজেয় আহ্বান।[৫৫]

পরস্পরের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ, সংঘাতে মানবসভ্যতা আজ এক মহাসংকটময় মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধকে স্মরণ এবং তাঁরই বাণীকে আকুলভাবে কামনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ দুই মহাযুদ্ধের অমানুষিক অত্যাচার ও ব্রাহ্মণ সমাজে নরবলি হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠান কবির জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস এরাই আবার মুক্তিলাভের আশায় বুদ্ধের সামনে মন্দিরে পূজা দেয়!

ধুপ জ্বলল, ঘণ্টা বাজল, প্রার্থনার রব উঠল আকাশে
'করুণাময়, সফল হয় যেন কামনা'–
কেননা, ওরা যে জাগাবে মর্মভেদী আর্তনাদ
অভ্রভেদ করে,
ছিঁড়ে ফেলবে ঘরে ঘরে ভালোবাসার বাঁধনসূত্রে,
ধ্বজা তুলবে লুপ্ত পল্লীর ভস্মস্তূপে,
দেবে ধুলোয় লুটিয়ে বিদ্যানিকেতন,
দেবে চুরমার করে সুন্দরের আসনপীঠ।
তাই তো চলেছে ওরা দয়াময় বুদ্ধের নিতে আশীর্বাদ।[৫৬]

রবীন্দ্রনাথ দুঃখ ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, '*অন্ত কারুণিক বুদ্ধ তো এই পৃথিবীতেই পা দিয়েছেন তবু এখানে নরকের শিখা নিবল না*'।[৫৭] কবি 'বুদ্ধ ও যুদ্ধ' শীর্ষক রচনাটিও জাপানি আগ্রাসন ও লোক দেখানো বুদ্ধের প্রতি ভক্তিকে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন;

জাপানেতে যুদ্ধের দামামা
বাজাইছে বুদ্ধের ভক্ত, কালীঘাটে রেগে বলে শ্যামা মা
আমি তবে কোথা পাব রক্ত?
কবি বলে প্রশ্নের জবাব কি
পাও নাই সংবাদপত্রে।
রক্তের আছে কিছু অভাব কি
দেশ-জোড়া নরবলি সত্রে?
নাজিদের বর দেওয়া স্থির যদি
ধরণীরে অন্যায় পিটবে, রক্তের বন্যায় নিরবধি
দেবীদের ক্ষুধাতাপ মিটবে।
বল তবে বল জয় কালী মা, বল জয় দয়াময় বুদ্ধ,
যমের হোমের শিখা জ্বালি, মা, অক্ষয় হয়ে থাক বুদ্ধ।[৫৮]

এভাবে বিশ্বমানবতার কবি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ন্যায় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছেন। এতো কিছুর পরও কবি নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস রেখেছেন যে, আজকের হিংসা, হানাহানি, যুদ্ধবিগ্রহের দাবানলের সামনে অশান্তবিশ্বে শান্তির একমাত্র মুক্তি বুদ্ধের বাণী। তাই এই সংকটের মধ্যে বুদ্ধের আবির্ভাব কবি কামনা করেছেন;

নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
কর' ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন' অমৃতবাণী,
বিকশিত কর' প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে. হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য।[৫৯]

পৃথিবীতে বুদ্ধের মহত্ত্বের কাছে তিনি নিজেকে নত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মহত্ত্বের পূজারী, তাই বুদ্ধের মহত্ত্ব তাঁকে আকৃষ্ট যতটা করেছে; তেমন আর কারো নয়। মানবজাতিকে অজ্ঞানতা থেকে মুক্তির পথ অদম্য সাহস ও দৃঢ়তা। বুদ্ধদেব গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধের শিক্ষা বিষয়ে বলেন;

নহি বেরেন বেরানি সম্মতী'ধ কুদাচনং,
অবেরন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো।[৬০]

অর্থাৎ জগতে শত্রুতার দ্বারা কখনো শত্রু নিরষণ হয় না, মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার নিরসন হয়। ভারতে বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধের প্রতিমূর্তির সামনে বুদ্ধকে অর্ঘ্য নিবেদন করে মাথা নত করেন। বুদ্ধ মহিমা রবীন্দ্রসাহিত্যে যেভাবে স্পর্শ করেছে, বাংলা নয়; শুধু ভারতীয় সাহিত্যেও তা ছিল বিরল। ভারতীয় সাহিত্যে অনেকেই বুদ্ধের চরিত্রমহিমা বিশ্লেষণে গ্রন্থে তুলে আনার চেষ্টা করেছেন ঠিক, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো আর কোনো ব্যক্তি সেভাবে কাব্যে, উপন্যাসে, গল্পে, প্রবন্ধে, নাটক ও মননের ক্ষেত্রে বুদ্ধমহিমাকে তুলে এনেছেন; তাঁর তুলনা নেই। ভারতীয় ইতিহাসে ভগবান বুদ্ধের আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের লেখনীতে তুলে আনার যে অবদান রয়েছে, তা সবার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উপসংহার : *আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি। এ কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলঙ্কার নয়, একান্তে নিভৃতে যা তাঁকে বার-বার সমর্পণ করেছি সেই অর্ঘ্যই আজ এখানে উৎসর্গ করি।* এরই পরিপ্রেক্ষিতে উপলব্ধি করা যায়, বুদ্ধের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল প্রবল। তিনি একাধিকবার ভারতে বুদ্ধগয়ায় ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর জীবনে বুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বুদ্ধকে তিনি গুরু হিসেবে জানতেন। তাঁর মধ্যে পেয়েছেন মানবতার শান্তির সুবাতাস। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাঁর

বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম। তিনি তাঁর সাহিত্যে বিশেষ করে প্রবন্ধে, কবিতায়, উপন্যাসে ও নাটকে বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের আদর্শের গুণমহিমা তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ শুধু একজন বুদ্ধানুরাগী ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন বুদ্ধের আদর্শের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী। তিনি স্বীকার করেছেন; 'বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি তাঁর জীবনের সব সফল বহন করেছে। বর্তমান অশান্ত ও সংঘাতময় বিশ্বে বুদ্ধের অমীয় বাণী মানব জাতির উন্মেষ সাধনের প্রধান মূলমন্ত্র যা নতুন প্রাণের সঞ্চার হবে। তাই বুদ্ধকে সম্বোধন করে কবি বলেছেন;

'চিত্তে হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, অমিতায়ু,
আয়ু করো দান
তোমার বোধন মন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক প্রাণবান।' [৬১]

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মকে পূর্বগামী সাহিত্য পণ্ডিতরা যেভাবে মূল্যায়ন করেছেন, তবে রবীন্দ্রনাথ ভিন্নভাবে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বগামীদের দৃষ্টিতে বুদ্ধকে অবতাররূপে গণ্য করলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে মহামানব হিসেবে মনে করেন। বুদ্ধকে তিনি শ্রদ্ধা ও মর্যাদার আসনে দেখেছেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ইতিহাসবিদদের ধারণা যে, বৌদ্ধধর্ম যে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত বললেও রবীন্দ্রনাথ কখনো তা মনে করেননি। এখানেই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধের অহিংসার অমিয়বাণী ভারতের গন্ডি পেরিয়ে সমগ্র মানবজগতকে হৃদয়াসনে জয় করেছে ইতিহাসে তা বিরল। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধকে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে অভিহিত করেছেন। বুদ্ধের আদর্শ কবির অনুপ্রেরণা ও শ্রদ্ধার নিদর্শন তাঁর সাহিত্যে বিশেষকরে কবিতায়, গানে, গল্পে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে ও নাটকে প্রকাশ করেছেন। কবির দৃষ্টিতে বুদ্ধ একজন মানবতাবাদী মহামানব, মহাগুরু। করুণাময় বুদ্ধের ধর্ম পরিশুদ্ধ, পরিশীলিত মানবধর্ম। 'সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু' মানবজগতের অন্তরে এই মৈত্রীবাণী জাগরণ সৃষ্টি করেছেন। অশান্ত বিশ্বে যেখানে দেশে-দেশে, জাতিতে-জাতিতে, ধর্মে-ধর্মে বিরোধ, পৃথিবীর মানবসভ্যতাকে বিপন্ন করেছে, দুটা বিভিষীকাময় মহাযুদ্ধের ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছেন, তাই কবি বুদ্ধের মৈত্রীর অমিয়বাণী শান্তিপ্রতিষ্ঠায় একান্তভাবে কামনা করেছেন। বুদ্ধই বিশ্বে সমগ্র মানুষের অন্তরকে জয় করতে পারবে মৈত্রীবাণী দিয়ে। তাই কবি যথার্থই বলেছেন,–'বুদ্ধই পৃথিবী জয় করেছিলেন, আলেকজান্ডার করেননি।' বুদ্ধ জীবনাদর্শই ছিল কবির চেতনার মূলমন্ত্র। বুদ্ধের আদর্শ তাঁর সাহিত্যভান্ডারে লেখনীর মাধ্যমে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেছেন। কবি এশিয়ায় বৌদ্ধ অধ্যুষিত দেশে পরিভ্রমণ করে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধসংস্কৃতি প্রতি অনুরাগ ও আকর্ষণে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছেন। অষ্টম শতকে নির্মিত বিশ্ববিখ্যাত বোরোবুদুর বৌদ্ধমন্দির দর্শনে কবির মনে ভাবাবেগ উৎপন্ন হয়েছে, তা লেখনীতে প্রকাশ করেন;

সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া;
তাই আসিয়াছে দিন,

পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,

আবার তাহারে

আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে

শুনিবারে

পাষাণের মৌনতষ্টে যে-বাণী রয়েছে চিরস্থির-

কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর

আকাশে উঠিছে অবিরাম

অমেয় প্রেমের মন্ত্র,–'বুদ্ধের স্মরণ লইলাম।'[৬২]

'সকলকলুষতামসহর' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা ছিল সকল কলুষতা দূর করে মানব মুক্তির শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর ব্যাকুল প্রার্থনা জোরালো কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে। মানুষের বিভীষিকাময় জীবনপ্রবাহ হতে মুক্তির মহাশান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় মহামানব বুদ্ধের অমৃতময় বাণী। মানুষের সংকটময় মুহূর্তে পরিত্রাণে কবি মনে দৃষ্টি বুদ্ধকেই;

করুণাময়, মাগি লরণ–

দুর্গতিভয় করহ হরণ, দাও দুঃখবন্ধতরণ

মুক্তির পরিচয়।[৬৩] সকলকলুষতামসহর

যখন মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, ধর্মে-ধর্মে পৃথিবী হিংসা ও দ্বন্দ্বে ভেড়াজালে জর্জরিত কবিমনে দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, মানবতার অগ্রদূত, মানবমুক্তির মুক্তপুরুষ বুদ্ধই এই দুরবস্থা হতে মুক্তি দিতে পারবে। বুদ্ধের প্রেম ও মৈত্রী বাণীই মানুষের অন্তরে একমাত্র সম্বল। বুদ্ধকে কবি সম্বোধন করেন 'মহাপ্রাণ', 'দানবীর', 'মহাভিক্ষু', 'করুণাঘন', 'অনন্তপুণ্য'। কবি অপকটে স্বীকার করেন;

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,

ঘোরকুটিল পথ তার, লোভজটিল বন্ধ।

নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,

কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী।

বুদ্ধের আদর্শই রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ অনুপ্রেরণা সমুজ্জ্বল হয়েছে। বুদ্ধের ঐক্যের মধ্যে আছে মহান কল্যাণপ্রেরণা। রবীন্দ্রসংস্কৃতি জাগরণের মূল উৎস বুদ্ধের ঐক্যের বাণী। মহামানব বুদ্ধের সত্যধর্ম বা মানবধর্ম কবি জীবনাচরণে প্রতিফলন ও ধর্মবোধ জাগরিত হয়েছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ :

১. সুধাংশু বিমল বড়ুয়া, *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, মিলনপল্লী কো-অপারেটিভ, কলকাতা, ১৩৭৪, পৃ. ৭৩।
২. আশা দাশ, *বৌদ্ধধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ*, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯।
৪. *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।
৫. শিমুল বড়ুয়া (সম্পা), *করুণাঘন, ধরণীতল কর'কলঙ্কশূন্য*, অমিতাভ প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১১, পৃ. ২৩০।
৬. *রবীন্দ্রনাথ ওবৌদ্ধসংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭; R.C. Dutt, *Civilization of India* . J.M Dent. London, 1900, p. 41
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।
১০. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৭৮।
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।
১৩. *করুণাঘন, ধরণীতল কর'কলঙ্কশূন্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১।
১৪. *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।
১৭. সুজিতকুমার বসু (সম্পা.), *রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ. ৫৫; *করুণাঘন, ধরণীতল কর'কলঙ্কশূন্য, প্রাগুপ্ত*, পৃ. ২৩২।
১৮. রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ২৪৯; 'নটীর পূজা', রচনাবলী (পল্লব সরকার) ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯১৭-১৮।
১৯. *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ.* ৮৬।
২০. রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৪১।
২১. প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৪৬।
২২. রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৪৫।
২৩. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪৬।
২৪. *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৮৮।
২৫. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৮৯।
২৬. *রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধসংস্কৃতি, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০।
২৭. *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯০।
২৮. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯০; বাল্মীকিপ্রতিভা', রবীন্দ্র রচনাবলী (পল্লব সরকার) ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৯-৫০০।
২৯. রবীন্দ্র রচনাবলী প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ. ৫৭৪।
৩০. *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯২।
৩১. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯২।
৩২. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯২।

৩৩. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯২; 'ঘরে বাইরে', রবীন্দ্র রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১।
৩৪. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯০।
৩৫. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯০।
৩৬. *রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪৯।
৩৭. অজিতকুমার চক্রবর্তী, *রবীন্দ্রনাথ*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৫৩, পৃ. ৮১-৮২।
৩৮. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, *'রবীন্দ্রজীবনী' ৪র্থ খণ্ড*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, (১৯৩৫-১৯৪১), পৃ. ২৩।
৩৯. *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯৫।
৪০. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯৬।
৪১. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯৬।
৪২. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯৭।
৪৩. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯৭।
৪৪. *রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৫৭।
৪৫. *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯৮।
৪৬. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯৯।
৪৭. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯৯।
৪৮. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯৯।
৪৯. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯৯।
৫০. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯৯।
৫১. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১০০।
৫২. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১০০।
৫৩. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১০১।
৫৪. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১০১।
৫৫. *রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৫৩।
৫৬. *রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯৭। *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১০২। 'পত্রপুট' ১৭ সংখ্যক কবিতা (১৯৩৭)। এ কবিতার ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ 'নবজাতক' এর 'বুদ্ধভক্তি' কবিতা। এ কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "জাপানের কোনো কাগজে পড়েছি জাপানি সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধমন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে; ভক্তির বাণী বুদ্ধকে।"
৫৭. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১০২।
৫৮. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১০২।
৫৯. *রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১০৩।
৬০. ধর্মাধার মহাস্থবির, *ধর্মপদ*, বৌদ্ধ ধর্মাংকুর সভা, কলকাতা, ১৯৫৪, পৃ. ২।
৬১. *রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৫৩।
৬২. বনশ্রী মহাথের, *বৌদ্ধধর্ম-দর্শন ও সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড*, বাংলাদেশ বুদ্ধবাণী প্রচার বোর্ড, চট্টগ্রাম, ১৪২৭, পৃ. ২৩

তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্মে বৌদ্ধ প্রভাব

রবীন্দ্রনাথের জীবনপ্রবাহ পর্যালোচনার মধ্যে বিশেষ দিকটি বেশি ফুটে উঠেছে বৌদ্ধধর্মের মূল ভাবধারা ও বৌদ্ধসংস্কৃতি। তাঁর চেতনায় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির উন্মেষ সাধন হয়েছে। তৎকালীনসময়ে কবিকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে বৌদ্ধধর্মও দর্শনকে। বুদ্ধের ধর্ম, বর্ণবৈষম্য, সামাজিক অবস্থা, ভেদাভেদ, জাতিপ্রথা জোরালো প্রতিবাদের সুর কবিগুরুকে প্রভাবিত করেন। রবীন্দ্রনাথ সেটাই উপলব্ধি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন 'বৌদ্ধধর্ম তো ভারতেরই ধর্ম'।[১] বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে নতুনভাবে পুণরুদ্ধারের এক অনন্য সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিল নিবিড় যোগসূত্র। রবীন্দ্রনাথ এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পরিভ্রমণ করে বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কৃতি, জীবন দর্শনকে তার নিজের জীবন লেখনীতে বিশেষ করে কবিতা, গানে, গল্পে, উপন্যাসে ও নাটকে তুলে ধরেছেন; যা রবীন্দ্রচেতনায় গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন। তার লেখনীর মধ্যে বৌদ্ধধর্মের অনেক ইতিহাসের ঘটনা ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মে বুদ্ধের দর্শন ইঙ্গিত বহন করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সংস্কৃতি জগতে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। প্রাচীন ভারতে দুইশত বছর পূর্বেও তেমন বেশি কোনো বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিচরণ পরিলক্ষিত ছিল না এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কিছু কিছু অঞ্চলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বসবাস থাকলেও বিভিন্ন পূজা, তন্ত্র, মন্ত্র, ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন আলোচনা সুযোগ তেমন ছিল না। বিভিন্ন শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচার, সম্প্রাদায়িক রোষানলে, বুদ্ধবিদ্বেষী লোকের প্রভাব বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে ও ধর্মের প্রতি বেশি আঘাত এসেছিল। ধর্মের সংকটময় মুহূর্তে ঊনবিংশ শতকদের মধ্যভাগের দিকে ঠাকুর পরিবারের পক্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম দর্শন হারানো গৌরব, ধর্ম, সংস্কৃতি, পুনরায় ফিরে পাওয়ার জন্য সাহিত্যকর্মে লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে শুধু রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করেছেন তা নয় তাঁর পিতাকেও বুদ্ধ চেতনাকে তাঁর মানস পটে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সকল সদস্যকে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছেন; যা তাঁদের সাহিত্যকর্মে পড়লে ধারণা করা যায়। বিশেষ করে শ্রীলংঙ্কা ভ্রমণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক জীবনে বৌদ্ধসংস্কৃতি চর্চায় বেশি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পরিবারে প্রতি সদস্যের বৌদ্ধ চেতনার ছাপ স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। শ্রীলংঙ্কায় বৌদ্ধদের ধর্মচেতনা, ভিক্ষুসংঘের ধ্যান ধারণা, জীবনচর্চা, রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান, সবচেয়ে বেশি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারকে প্রভাব বিস্তার করেছেন। সিংহলে সর্বপ্রথম বৌদ্ধ শাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল।[২] রবীন্দ্রনাথ কবিতায়, গল্প, নাটকে, প্রবন্ধ, গানে, বৌদ্ধধর্ম ও দশর্নকে অত্যন্ত ফুটে তুলেছেন বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে রবীন্দ্রনাথের জীবনে বেশি প্রভাবিত করার মূলে রয়েছে কবি রাজেন্দ্রলালের অনুপ্রেরণা। রবীন্দ্রনাথের জীবন

প্রণালিতে কবি রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কে তিনি বলেছেন; *"এ পর্যন্ত বাংলাদেশের বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলাল স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারও নহে।"*

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও নাটক বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন রচনা রাজেন্দ্রলাল এর *Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়।[৩] রবীন্দ্রনাথ পরিবারে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলো এক একটি বৌদ্ধ সাহিত্যের দর্শন, ধর্মের ভাবধারা, চিন্তা শক্তি, নাটক, উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন বুদ্ধের ভাবধারা বীজ বপন করে। যার জ্বলন্ত প্রমাণ শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।সিংহলেই সর্ব প্রথম বৌদ্ধ শাস্ত্র আবিস্কৃত হয়েছিল।[৪] শান্তিনিকেতনে শত শত ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যাশিক্ষা, ধর্মচর্চা, সংস্কৃতিচর্চা, রচনা ও প্রকাশে তা বহিঃপ্রকাশ। শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠায় তাতে রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধধর্ম সংস্কৃতির প্রতি আরও গভীরভাবে অনুরাগ বেড়ে যায়। রচনাগুলো জন্মের পূর্বেও পরিবারের বৌদ্ধধর্মের চর্চা ছিল যা পিতা সিংহলে গমনের মধ্যে বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের চেতনায় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির ভারত উপমহাদেশে বৌদ্ধসংস্কৃতির সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। সে যুগের ভাবধারা কবি চিত্তে যে সাড়া জেগেছে, তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথের অন্তরের সাথে যোগসূত্র ছিল বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির ভাবধারা। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয় বিশেষ করে বৌদ্ধধর্ম দর্শন গবেষণা মূল উপজীব্য। বৌদ্ধসংস্কৃতির অনুশীলনে বহু মনীষীর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ এশিয়ার প্রায় সকল বৌদ্ধপ্রধান দেশে ভ্রমণ করার সুযোগ হয়েছিল এবং তিনি দেখেছেন বৌদ্ধধর্মের জীবন্ত রূপ। সেসব দেশে ভ্রমণ করে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, সেখানকার শিল্পসভ্যতার সাথে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণরসেই পুষ্ট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণের মূলে এসকল কাহিনী তার প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্পর্শে এসে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি বেশি অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে রাজেন্দ্রলালের প্রভাব সীমাহীন। রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণে রাজেন্দ্রলালের ভূমিকা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি যেসকল বৌদ্ধকাহিনী নিয়ে কবিতা ও নাটক রচনা করেছেন, সে কাহিনীগুলো রাজেন্দ্রলালের রচিত 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' গ্রন্থ থেকে উৎস গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের তত্ত্ববিদ সুকুমার সেন মহাশয় বলেছেন; *'বৌদ্ধসাহিত্যে রাজেন্দ্রলালের প্রকৃত শিষ্য বলতে যদি কেউ থাকেন তো রবীন্দ্রনাথ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো রাজেন্দ্রলাল-দীক্ষিত শিষ্য বৌদ্ধশাস্ত্র নিয়ে ভালো গবেষণা করেছেন জানি। কিন্তু বৌদ্ধগ্রন্থে যে সাহিত্যরস আছে তার নিষ্কর্ষ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ করতে পারেন নি, না এদেশে, না বিদেশে। সুতরাং 'রাজা', 'অচলায়তন' ও 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'র জন্যে আমাদের কৃতজ্ঞতার কিঞ্চিৎ অংশ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রাপ্য।'*[৫]

রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবন ছিল সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। তৎমধ্যে বৌদ্ধসংস্কৃতি চর্চার প্রতি সবচেয়ে বেশি অনুরাগ ছিল। রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বে জোড়াসাঁকোরে ঠাকুর পরিবারে বৌদ্ধসংস্কৃতি ভাবধারার সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল। ১৮৫৯ সালে পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সিংহল পরিভ্রমণের মাধ্যমে এবং সাথে ছিলেন পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ও পুত্রপ্রতিম কেশবচন্দ্র। সে সময়ে বৌদ্ধধর্মের সংস্কৃতির দর্শনে রবীন্দ্রনাথের চেতনায় আরো গভীর উৎসাহ বেড়ে যায় যখন সিংহল থেকে বৌদ্ধধর্মের আদর্শ নিয়ে আবার দেশে ফিরে আসেন। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে বুদ্ধচেতনার নতুনভাবে সঞ্চার হয়। ঠাকুর পরিবারে বৌদ্ধধর্ম চর্চার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আর্যধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত' (১৮৯৯) এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৌদ্ধধর্ম' (১৯০১) গ্রন্থের নাম উল্লেখের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থটি রচনায় বাংলাসাহিত্যে এক বিশেষ স্থান দখল করেছে। এই গ্রন্থে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বগুলো বর্ণিত হয়েছে। পিতার সাথে সিংহল ভ্রমণে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বৌদ্ধ ধর্মের যে আদর্শ স্বচক্ষে উপলব্ধি করেছিলেন তা গ্রন্থ রচনায় সেই প্রভাব দেখা যায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, সিংহল থেকে ভ্রমণ করে আসার পর রবীন্দ্রনাথ ১৮৬২ সালে মার্চ মাসে ইংল্যান্ড ভ্রমণে গিয়ে ভারততত্ত্ববিদ পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের সংস্পর্শে আসেন।[৬] তৎকালীন ভারতীয় সংস্কৃতি ছাড়াও বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুপ্রাণিত হবেন এতে কোনো সংশয় নাই। রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধচেতনার প্রভাব বিশেষ করে আমাদের দেশে বৌদ্ধসংস্কৃতির মনোনিবেশে সঞ্চার হয়েছে ইংরেজ কবি এডুইন আর্নল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' (১৮৭৯) কাব্যগ্রন্থ রচনায় একটি বিশেষ ভূমিকা। বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে ওল্ডেনবার্গ, ম্যাক্সমুলার, রিস্ ডেভিডস গবেষণায় পণ্ডিত সমাজে সীমাবদ্ধ ছিল। এই গ্রন্থটি রচনাতে রবীন্দ্রনাথকেও হৃদয় মুগ্ধ করেছে। তিনি বুদ্ধগয়ায় যাওয়ার সময় গ্রন্থটি সাথে নিয়ে যেতেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের উৎস এই গ্রন্থের প্রভাব লক্ষ করা যায়। 'কল্পনা' কাব্য থেকে 'বিদায়' কবিতাটি 'লাইট অব এশিয়া'য় বর্ণিত সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের চিত্র অবলম্বনে রচিত। এই কবিতাটির কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া হলো :

এবার চলিনু তবে
সময়ে হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।
তুমি ঘুমাইছ নিমীলনয়নে,
কাঁপিয়া উঠিছ বিরহস্বপনে,
প্রভাতে জাগিয়া শূন্য শয়নে
কাঁদিয়া চাহিয়া রবে
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে

অরুণ তোমার তরুণ অধর,
করুণ তোমার আঁখি,
অমিয়বচন সোহাগবচন
অনেক রয়েছে বাকি।
পাখি উডয়ে যাবে সাগরের পার,
সুখময় নীড় পড়ে রবে তার
মহাকাশ হতে ওই বারে বার
আমারে ডাকিছে সবে
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

ভারতীয়দের জীবনপ্রবাহ ও মননে যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও তার প্রমাণ পাওয়া যায় এডুইন আর্নল্ডের কাব্যগ্রন্থটি। গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেবচরিত' নাটক ও নবীনচন্দ্রের 'অমিতাভ' কাব্য অনুপ্রেরণার ফসল। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধা ও আকৃষ্ট হয়েছিলেন বুদ্ধগয়া ও সারনাথ ভ্রমণে। রবীন্দ্রনাথ 'সমালোচনা' (১৮৮৮) গ্রন্থটিতে বলেছেন; '*আমি একজন বুদ্ধের ভক্ত। বুদ্ধের অস্তিত্বের বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যখন সেই তীর্থে যাই, যেখানে বুদ্ধের দন্ত রক্ষিত আছে, সেই শিলা দেখি যাহার উপরে বুদ্ধের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে, তখন আমি বুদ্ধকে কতখানি প্রাপ্ত হই।*'[৭]

রবীন্দ্রনাথ দু'বার বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯০৪ সালের অক্টোবর মাসে প্রথমবার বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন সস্ত্রীক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, স্বামী শঙ্করানন্দ, স্বামী সদানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা ও আচার্য যদুনাথ সরকারসহ সুধীবৃন্দ। গিরিডি হতে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র মধুপুরে এসে সবার সাথে যোগ দিয়ে সপ্তাহকাল বুদ্ধগয়ায় ছিলেন। এই সময়ে তাঁরা প্রতিদিন এডুইন আর্নল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' এবং ওয়ারেনের বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থটি মাঝেমধ্যে সুযোগ পেলে পাঠ করতেন। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে একটি ঘটনা গভীর রেখাপাত করে। ঘটনাটি হলো ফুজি নামে জাপানের এক মৎস্যব্যবসায়ী বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষের নিচে ধ্যানরত অবস্থায় ছিল।[৮] ধ্যানবস্থায় মানুষটিও রবীন্দ্রদৃষ্টিতে এক অসাধারণ মহিমায় প্রকাশ পেয়েছে এবং শেষ জীবনেও রবীন্দ্রনাথ তার কথা ভুলতে পারেনি। অনেকদিন পরে তিনি কলকাতার ধর্মরাজিক চৈত্যবিহারে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে (১৯৩৫) ভাষণ দেওয়ার সময় এই দরিদ্র মৎস্যজীবীর উল্লেখ করেছেন;

'*দেখলুম, দূর জাপান থেকে সমুদ্র পার হয়ে একজন দরিদ্র মৎস্যজীবী এসেছে কোনো দুষ্কৃতির অনুশোচনা করতে। সায়াহ্ন উত্তীর্ণ হল নির্জন নিঃশব্দ মধ্য রাত্রিতে, সে একাগ্রমনে করজোড়ে আবৃত্তি করতে লাগল। আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম কত শত শতাব্দী হয়ে গেছে, একদা শাক্যরাজপুত্র গভীর রাত্রে মানুষের দুঃখ দূর করবার*

সাধনায় রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে বেরিয়েছিলেন : আর সেদিনকার সেই মধ্যরাত্রে জাপান থেকে এল তীর্থযাত্রী গভীর দুঃখে তারই শরণ কামনা করে। সেদিন তিনি ঐ পাপপরিতপ্তের কাছে পৃথিবীর সকল প্রত্যক্ষ বস্তুর চেয়ে প্রত্যক্ষতম, অন্তরতম।[৯]

১৯১৪ সালে দ্বিতীয়বার রবীন্দ্রনাথের সাথে কন্যা মীরা, জামাতা নগেন্দ্রনাথ ও হেমলতা ঠাকুরসহ অনেক আত্মীয় বুদ্ধগয়ায় এসেছিলেন। এবার বুদ্ধগয়ায় থাকাকালীন কবি মাত্র তিন দিনের মধ্যে (২৩-২৫ আশ্বিন, ১৩২১) গীতাঞ্জলির অন্তর্গত দশটি গান রচনা করেন। সে সময়ে রচিত গান;

সন্ধ্যাতারা যে ফুল দিল
তোমার চরণ-তলে
তারে আমি ধুয়ে দিলেম
আমার নয়ন-জলে।[১০]
এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার।
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা
সফল হল কার।...
বহুযুগের উপহারে
বরণ করি নিল কারে
কার জীবনে প্রভাত আজি
ঘোচায় অন্ধকার।[১১]

রবীন্দ্রনাথের রচিত গানে বুদ্ধচেতনা এবং বুদ্ধগয়ায় ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধের প্রতি যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, সে প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনির বলেন; '*Only once in his life, said Rabindranath, did he feel like prostrating himself before an image, and that was when he saw the Buddha at Gaya*'.[১২]

বুদ্ধগয়ায় রবীন্দ্রনাথের জীবনে একবারই মূর্তির সামনে প্রণাম করেছিলেন। এতে বুদ্ধমূর্তি দর্শন করে বুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং বুদ্ধচেতনার ভাব উদয় হয়। এ প্রসঙ্গে হেমলতা ঠাকুরের বিবরণ শ্রীমতী অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় লিপিবদ্ধ করেছেন :

> *'প্রতিদিন প্রাতরাশের পর গুরুদেব বুদ্ধমন্দিরে গমন করতেন একাকী এবং প্রায় দু-তিন ঘণ্টা তিনি সেখানে অবস্থান করতেন। সঙ্গের কিংবা বাহিরের কেউ সে সময়ে মন্দিরে যেতে পারবে না, এই নিষেধাজ্ঞা সকলের জানা থাকলেও বড়মা বলেন তার মনে জাগে দারুণ কৌতূহল এবং এক প্রশ্ন। প্রশ্নটি কাকামশাই এত সময় মন্দিরে কি করেন? মুর্তিপূজার বিরোধী ব্রাহ্মধর্মের*

প্রবর্তক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র-রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধমন্দিরে কেন অতিবাহিত করেন অতটা সময়'? কৌতূহলবশত হয়ে একদিন তিনি সবার অগোচরে অনুমতিব্যতিত মন্দিরে যান এবং দেখতে পান উচ্চ বেদির মধ্যে উপবিষ্ট অবস্থায় বড় এক বুদ্ধমূর্তির সামনে দন্ডায়মান কবি ধ্যানগম্ভীর প্রতিমূর্তি, কান্নারত দুইচোখে পানি পড়ছে।[১৩]

রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের প্রবীণ শিক্ষক গোঁসাইজির কাছে শুনেছি, তিনি বুদ্ধগয়া থেকে আসার পর মস্তকমুণ্ডন করেছিল এবং তার মনে এক বৈরাগ্যজীবনের ভাব জাগ্রত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম ছাড়াও বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণের সন্ধান পাওয়া যায় যা, ১৯০৪ সালে চারুচন্দ্র বসু মহোদয়ের সম্পাদনায় ধম্মপদ প্রকাশনায়। এটি শুধু বাংলায় নয়, আধুনিক ভারতীয় ভাষার মধ্যেও এটিই প্রথম অনুবাদ। এই গ্রন্থটি প্রকাশের অল্প কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ নবরূপে বঙ্গদর্শনে (১৩১২ জ্যৈষ্ঠ) এর সমালোচনা করতে গিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে এক সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেন। রবীন্দ্রনাথের ধারণা ধম্মপদে ভারতবর্ষের সভ্যতা বা সত্যতা প্রকাশিত হয়েছে। গীতার উপদেশ ভারতের চিন্তাকে যেমন একটি সংহত মূর্তি দান করিয়াছে, ধর্মপদ গ্রন্থেও ভারতবর্ষে চিত্তের একটি পরিচয় তেমনি ব্যক্ত হইয়েছে।[১৪]

ধম্মপদের মর্মবাণী আমাদের মন থেকে প্রায় হারিয়ে গেল। শুধু ধম্মপদ কেন, বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধসংস্কৃতি ভারতবর্ষ থেকে বিলুপ্ত হয়েছিল। তাই বৌদ্ধধর্মের প্রতি আমাদের উদাসীনতা লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন;

'এই ইতিহাসের (ভারতীয় সংস্কৃতির বহুতর উপকরণ যে বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে বহুদিন-অনাদৃত এই বৌদ্ধশাস্ত্র য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন– আমরা তাহাদের পদানুসরণ করিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি, ইহাই আমাদের দেশের পক্ষে দারুণতম লজ্জার কারণ। সমস্ত দেশে পাঁচজনলোকও কি বৌদ্ধশাস্ত্র উদ্ধার করাকে চিরজীবনের অতস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না? এই বৌদ্ধশাস্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কানা হইয়া আছে, এ কথা মনে করিয়াও কি দেশের জন-কয়েক তরুণ যুবার উৎসাহ এই পথে যাবিত হইবে না'?[১৫]

বৌদ্ধশাস্ত্র উদ্ধারে রবীন্দ্রনাথসহ যুবকদেরকেও আবেদন জানিয়েছিলেন। এর প্রমাণ বিশ্বভারতী। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বিশ্বভারতীতে বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চার শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের আগমনে বিশ্বভারতী দেশে বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯০৬ সালে সংস্কৃত পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় পালি ভাষা ও বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষায় ব্রতী হন। পালি শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে বিধুশেখর শাস্ত্রী পালি ব্যাকরণ গ্রন্থ 'পালি প্রকাশ' (১৯১১) রচনা করেন। এই সময়ে রথীন্দ্রনাথকে ধম্মপদের বাণী মুখস্থ করতে হয়। তা ছাড়া নবাগত অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রীর

তত্ত্বাবধানে রথীন্দ্রনাথ অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' কাব্য বাংলায় অনুবাদ করেন (১৯০৬)।[১৬] রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় বিধুশেখর শাস্ত্রীর উৎসাহে বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চার সূত্রপাত হয় যা পরবর্তী সময়ে শান্তি নিকেতনে চীন ভবন প্রতিষ্ঠায় বোঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে যেমন বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চার কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। পাশাপাশি বৌদ্ধ পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ জানিয়ে চীন-জাপান, শ্রীলংকা-বার্মা, জাভা-শ্যাম প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করতেন। রবীন্দ্রনাথের এই ভ্রমণের মূলেও রয়েছে ভারতের বুদ্ধের বিশ্বমৈত্রীর বাণীকে জয় করা।

রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ সালে জাপান হয়ে বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনে গমন করেন। এশিয়ার বৌদ্ধদেশগুলোর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বার্মাদেশে প্রথম যাত্রা করেছিলেন। তার সফরসঙ্গি ছিলেন দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ পিয়ার্সন ও মুকুল দে। বার্মায় এসে পরের দিন ২৫শে বৈশাখ জন্মদিনের প্রভাতে কবি সবান্ধব বার্মার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্দির শোয়েডেগন প্যাগোডা দর্শন করেন। এই মন্দির দর্শনে কবি বার্মার সংস্কৃতির নিজস্ব রূপ উপলব্ধি করে বললেন;

'এতক্ষণে একটা-কিছু দেখতে পেলুম। এতক্ষণ যার মধ্যে ছিলুম সে একটা অ্যাবস্ট্রাক্শন, সে একটা অবিচ্ছিন্ন পদার্থ। সে একটা শহর, কিন্তু কোনো একটা শহরই নয়। এখন যা দেখছি তার নিজেরই একটা বিশেষ চেহারা আছে। তাই সমস্ত মন খুশি হয়ে সজাগ হয়ে উঠল। আধুনিক বাঙালির ঘরে মাঝে খুব ফ্যাশনওয়ালা মেয়ে দেখতে পাই। দেখে মস্ত একটা অভাব মনে বাজে; মনে হয় ফ্যাশনটাকেই বড়ো করে দেখছি, বাঙালির মেয়েটিকে নয়; এমন সময় হঠাৎ ফ্যাশন-জালমুক্ত সরল সুন্দর স্নিগ্ধ বাঙালি ঘরের কল্যাণীকে দেখলে তখনই বুঝতে পারি, এ তো মরীচিকা নয়, স্বচ্ছ গভীর সরোবরের মতো এর মধ্যে একটি তৃষাহরণ পূর্ণতা আপন পদ্মবনের পাড়টি নিয়ে টলটল করছে। মন্দিরের মধ্যে ঢুকতেই আমার মনে তেমনি একটি আনন্দের চমক লাগল; মনে হল, যা-ই হোক না কেন, এটা ফাকা নয়, যেটুকু চোখে পড়ছে এ তার চেয়ে আরো অনেক বেশি। সমস্ত রেঙ্গুন শহরটা এর কাছে ছোটো হয়ে গেল। বহুকালের বৃহৎ ব্রহ্মদেশ এই মন্দিরটুকুর মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করলে'।[১৭]

ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক সাধনার আলোকে বার্মার হৃদয়স্পর্শ বিকাশে রবীন্দ্রনাথ এই মন্দিরে তারই প্রকাশ দেখতে পেলেন। এতে কবির অন্তর পুলকিত হলো। এখানে এসে কবির মনে এই ভাবের উদয় হয়েছে যে, "আর কোথাও না ঘুরে বেড়িয়ে (ব্রহ্মদেশের) পাড়াগাঁয়ে কোনো একটা বৌদ্ধমঠের কাছে গিয়ে চুপচাপ থাকতে পারলে বেশ আরাম পাবেন।"[১৮]

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ সালের ২৪শে মার্চ পুনরায় চীন হয়ে রেঙ্গুনে গমন করেন। কবি তিন দিন রেঙ্গুঁনে অবস্থান করেন। প্রথম দিন সন্ধ্যায় জুবিলী হলে কবিকে সংবর্ধনা জানানো হয় এবং অভিবাদনের উত্তরে কবি বলেন; "পৃথিবীর প্রত্যেক বড় জাতি পৃথিবীতে এমন কিছু একটা দেয় যার ফলে সে বিশ্বমানবের হৃদয়ে অমরতা লাভ করে। আর জগতের ইতিহাসে মৈত্রীর আদর্শই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ দান। এই মহৎ আদর্শকে অবলম্বন করে

একদিন ভারতীয় দূতেরা মরুপর্বত পার হয়ে পৃথিবীর দূর-দূরান্তের জাতিসমূহকেও এক নিবিড় আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ করেছে'।[১৯] জাপানে যাওয়ার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ১৯১৫ সালে তিনি জাপান যাওয়ার আয়োজন করলেও নানা কারণে যাওয়া হয়নি। অবশেষে ১৯১৬ সালে ২৯শে মে তিনি জাপানে কোবে বন্দরে অবতরণ করেন। ইতিপূর্বেই তাঁর সাথে ওকাকুরা ও কাওয়াগুচি- প্রমুখ জাপানিদের সান্নিধ্যে আসেন। জাপানের বন্দরে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গেই বিপুল সংবর্ধনা দেওয়া হয়। একে একে দীর্ঘদিনের পরিচিত জাপানি বন্ধুরা কবিকে দেখতে এলেন। বিখ্যাত চিত্রকর টাইকান ও কাট্টা, পরিব্রাজক কাওয়াগুচি এবং শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন জুজুৎসু শিক্ষক সানো বন্দরে অভ্যর্থনা দেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। জাপানিরা রবীন্দ্রনাথ শুধু একজন প্রাচ্যের ভারতীয় অতিথি নন, তিনি জাপানীদের আপনজন হিসেবে মান্য করতেন। রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে জাপানিদের খুবই আনন্দের সীমা নেই। কবি কোবেতে সপ্তাহকাল ছিলেন। আধুনিক জাপানের সৌন্দর্য্য দেখে কবি বলেছেন;

'এই জানালায় বসে কোবে শহরের দিকে তাকিয়ে এই যা দেখছি এ তো লোহার জাপান, এ তো রক্তমাংসের নয় একদিকে আমার জানালা, আর-একদিকে সমুদ্র, এর মাঝখানে প্রকার একটা শহর। চীনেরা যে রকম বিকটমূর্তি ড্রাগন আঁকে সেইরকম। আঁকাবাঁকা বিপুল দেহ নিয়ে সে যেন সবুজ পৃথিবীটিকে খেয়ে ফেলেছে। গায়ে গায়ে খোঁষাঘেষি লোহার চালগুলো ঠিক যেন তারই পিঠের আঁশের মতো রৌদ্রে ঝক্‌ঝক্ করছে। বড়ো কঠিন, বড়ো কুৎসিত এই দরকার নামক দৈত্যটা। মানুষের দরকার আছে, এই কথাটাই ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে, হুঁ করতে করতে, পৃথিবীর অধিকাংশকে গ্রাস করে ফেলছে'।[২০] জাপানে এসে যে জিনিসটি কবিকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে সেটি হলো জাপানি চরিত্রের সংযম, যা তিনি ইউরোপে দেখেননি। কবি জাপানের এই সত্য রূপটি তাঁর মনে উপলব্ধি করেছে।

এই জাতের সর্বপ্রধান শক্তি যেটা দেখতে পেয়েছি, সেটা হচ্ছে সংযম। তাদের দেহচালনার মধ্যে আশ্চর্য একটি ধৈর্য আছে; মনের মধ্যেও তা-ই। বহু শতাব্দীর অভ্যাসক্রমে এরা কোনো কাজই যেমন তেমন করে করে না; একান্ত নিবিষ্ট হয়ে ও শোভনভাবে করে দেখে কেবলই মনে হয় কাজের সমস্ত প্রণালীর মধ্যে আগাগোড়া এরা সমস্ত মনকে স্থাপিত করতে শিখেছে। এটাই হচ্ছে কর্মের মধ্যে ধ্যান।[২১]

জাপানিদের জীবনের সমস্ত কাজকর্ম যত্ন ও সংযতভাবে করে। এটাই হচ্ছে কর্মের মধ্যে ধ্যান। কবি জাপানিদের ধৈর্য, সংযম দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। জাপানিরা মনে করতেন এসকল গুণ পেয়েছে বুদ্ধের আদর্শ থেকে। জাপানিদের কথা শুনে কবি লজ্জিত হয়ে তাঁর দেশের কথা ভাবলেন। তিনি বলেন : 'শুনে আমার লজ্জা বোধ হয়। বৌদ্ধধর্ম তো আমাদের দেশেও ছিল, কিন্তু আমাদের জীবনযাত্রাকে তো এমন আশ্চর্য ও সুন্দর সামঞ্জস্যে বেঁধে তুলতে পারে নি। আমাদের কল্পনা ও কাজে এমনতরো প্রভূত আতিশয্য, ঔদাসীন্য, উচ্ছৃঙ্খলতা কোথা থেকে এল'।[২২] এই প্রসঙ্গে কবির মনে হয়েছে, জীবনযাত্রার রীতি যদি আমরা অসংকোচে

জাপানের কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারতাম তাহলে আমাদের ঘর দুয়ারে এবং ব্যবহার শুচি হত, সুন্দর হত, সংযত হত।[২৩]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সফরসঙ্গিদের নিয়ে কোবে থেকে ওসাকায় এলেন। সেখানে এক সভায় কবিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। কোবে থেকে জাপানের রাজধানী টোকিওতে কিছুদিন ছিলেন। কবি এখানে চিত্রকর বন্ধু য়োকোয়ামা টাইকানের বাড়িতে অবস্থান করেন। ১২ই জুন কবি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম অভিভাষণ দেন। পরদিন জাপানের বিশিষ্ট নাগরিকগণ এই সভায় উপস্থিত হয়ে বিখ্যাত উয়েনো পার্কে কানাইজি বৌদ্ধমন্দিরে কবিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই সংবর্ধনার উদ্যেক্তা জেন-সম্প্রদায়ের সোতো শাখার মঠাচার্য। এই সংবর্ধনায় কবি বাংলা ভাষণ দেন। কবির ভাষণটি জাপানি ভাষায় রূপান্তর করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যাপক কিমুরা। কাউন্ট ওকুমা ও বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ তাকাকুস্থ রবীন্দ্রনাথের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং ভোজ সভায় জাপানি সংস্কৃতি সম্পর্কে পরিচয় করে দেন। শিজুওকা আসার পর একজন জাপানি শ্রমণ অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে কবিকে সম্মান জানিয়েছিলেন, এতে তিনি জাপানের সংস্কৃতির গভীরতা উপলব্ধি করলেন।[২৪]

জাপানে এসে রবীন্দ্রনাথ The Nation ও The Spirit of Japan বিষয়ে বক্তৃতা করেছিলেন। এখানে জাপানিদের উগ্র সাম্রাজ্যবাদ, চীনের প্রতি অপমানকর শর্তারোপ ও কোরিয়ার জনগণের প্রতি অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনী কবি মনে বেদনার সঞ্চার করে। কবি সেদিন তার বক্তৃতায় সেসব দেশের প্রতি জাপানিদের উগ্র সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ধিক্কার দিয়ে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন। কিন্তু সেদিনের কবির ভাষণ জাপানিরা অন্তরে গ্রহণ করতে পারেনি বরং উল্টো প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ জাপানে আসার সময় যেভাবে অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন, কিন্তু বিদায়ের দিনে জাপানিরা কবির প্রতি সেভাবে সম্মান দেখাননি। একমাত্র হারা সান বিদায়ে উপস্থিত ছিলেন।[২৫]

জাপানি উগ্র সাম্রাজ্যবাদীদের উন্মত্ততাকে রবীন্দ্রনাথের তীব্র নিন্দা বজ্রকণ্ঠ বারবার ধ্বনিত হয়েছে। তাই তিনি কোনোদিন তাদের ক্ষমা করতে পারেন নি। একদিন কবি সংবাদপত্রে দেখলেন, জাপানি সৈনিক চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সাফল্য কামনায় মন্দিরে পূজা দিতে। এতে রবীন্দ্রনাথ কঠোর ভর্ৎসনায় লিখেছেন;

যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে।
ওদের ঘাড় হল বাঁকা চোখ হল রাঙা, কিড়মিড় করতে লাগল দাঁত।
মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভরতি করতে
বেরোল দলে দলে।
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
তার পবিত্র আশীর্বাদের আশায়।

বেজে উঠল তূরী ভেরি গরগর শব্দে,

কেঁপে উঠল পৃথিবী।[২৬]

১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার জাপান গমন করেন। তা ছাড়া আমেরিকার সাথে জাপানের রাজনৈতিক সম্পর্ক তেমন ভালো ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যে বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করতেন, তার মধ্যে International Relation অন্যতম। তিনি আমেরিকার আগ্রাসনের কথা স্মরণ করে দেন যে, দুর্বল প্রতিবেশীর প্রতি জাপানও সুবিচার করেনি। ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এসে সেই বছর সেপ্টেম্বর মাসে সাংহাইতে এশিয়াটিক অ্যাসোসিয়েশন গঠন করে।[২৭]

রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় এই সমিতি প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিল এশিয়ার মিলনের প্রাণকেন্দ্র। এই প্রসঙ্গে টোকিওতে প্রতিষ্ঠিত টেগোর সোসাইটিরও উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সোসাইটি রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি চর্চার প্রভাব অপরিসীম। ১৯২৯ সালে রবীন্দ্রনাথ শেষবার জাপান গমন করেন। এ ছাড়া দেশে ফিরে এসে কবি 'ধ্যানী জাপান' (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৬) শীর্ষক এক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লেখেন। জাপানে 'জেন' বা ধ্যান নামে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। জাপানি জীবনযাত্রায় এই ধ্যানের প্রভাব কবি লক্ষ করেছেন। তাদের প্রতিটা কাজ-কর্মে সংযমের দিকটা বেশি লক্ষ করা যায়। একদিন কবি বিখ্যাত চিত্রকর য়োকোহামার বাড়িতে দেখেন, একটি বুদ্ধমূর্তি এর সামনে বসে ধ্যান করে তবে তিনি ছবি আঁকেন। এই ধ্যানের দ্বারা চিত্রকরের রচনাশক্তির জড়তা ঘোচে, চিত্তের উদ্যম সম্পূর্ণ জাগ্রত হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার প্রাণকেন্দ্র। শ্রীলংকা থেকে ধর্মাধার মহাস্থবির বিশ্বভারতীতে আসেন। ১৯১৯ সালে বিশ্বভারতীর শুরুর পর এই বৌদ্ধভিক্ষু বৌদ্ধদর্শনের তাত্ত্বিক বিষয় আলোচনা করতেন। ধর্মাধার মহাস্থবিরের সাথে সাথে কবিও বৌদ্ধদর্শনের জটিল তত্ত্বগুলি হৃদয়ঙ্গমের চেষ্টা করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন;

মহাস্থবিরের বক্তৃতায় প্রথম প্রথম আমরা সকলেই যাইতাম কিন্তু দিন যতই যায়, শ্রোতার সংখ্যা ততই হ্রাস পায়। কারণ প্রথমত বিষয় কঠিন বৌদ্ধ দর্শন, দ্বিতীয়ত তিনি যে ভাষায় উপদেশ দিতেন তাহা না-হিন্দী, না-বাংলা, না-পালি, না-সিংহলী এক মিশ্রিত ভাষা। ইহার উপর মেয়েরা যেদিকে বসিতেন সেইদিকে পাখার আড়াল করিয়া কথা বলেন। মোটকথা, এই বক্তৃতা শুনিবার উৎসাহ প্রায় সকলেরই নিবিয়া আসিল। শেষ পর্যন্ত দেখিলাম শ্রোতাদের মধ্যে দুইজন টিকিয়া আছেন একজন বিধুশেখর, অপর জন রবীন্দ্রনাথ। কবি নিশ্চল হইয়া ধর্মগুরুর জটিল তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন।[২৮]

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন মহাস্থবিরের ভাষা শিক্ষা অনেকটা জঠিল মনে করে পরবর্তীকালে অধ্যাপক নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামীকে সিংহলে প্রেরণ করেছিলেন যাতে বৌদ্ধদর্শনে উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করার জন্য।

কবির অনুপ্রেরণায় গোঁসাইজিও শ্রীলংকা ও বার্মা এই দুদেশেই বৌদ্ধদর্শন বিষয়ে শিক্ষা করেন। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গোঁসাইজি যে শিক্ষা অর্জন করেন, তা বিশ্বভারতীর সেবায় নিয়োজিত করেন। গোঁসাইজি ভারতীয় সংস্কৃতি, দর্শন, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য শান্তিনিকেতনে 'চলমান বিশ্বকোষ' হিসেবে সকলের কাছে সমাদৃত। বৌদ্ধপণ্ডিত সিলভাঁ লেভি ১৮৬৩ সালে ফরাসিতে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃতি, দর্শন, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাহিত্যে পারদর্শিতার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯২১ সালে সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে আসেন। এরপর বিশ্বভারতীর অতিথি অধ্যাপক হিসেবে প্রথম যোগদান। আচার্য লেভি একমাত্র অধ্যাপক যিনি কবির আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য বিশ্বভারতীর কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বিশ্বভারতীতে চীনভবন প্রতিষ্ঠা ও বৌদ্ধশাস্ত্র নিয়ে গবেষণার পথ সহজ করাই তার প্রমাণ। এছাড়া চীনা ও তিব্বতী ভাষাতেও পারদর্শিতা ছিলেন। কবি উপলব্ধি করেছিলেন যে, পূর্ব এশিয়ায় পালি কিংবা ভারতীয় ভাষার চর্চা না থাকায় আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধদর্শনকে ভারতের সাথে আরোও মজবুত করার জন্য চীনা ও তিব্বতী ভাষার চর্চা অপরিহার্য। বিধুশেখর প্রমুখ ব্যক্তিগণ আচার্য লেভির নিকট চীনা ও তিব্বতী ভাষা শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচীও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আসতেন। বিশ্বভারতীর আর্থিক অবস্থা তখন এত ভালো ছিল না। এতো আর্থিক দৈন্যের মধ্যেও বিশ্বভারতীর জন্য রবীন্দ্রনাথ পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে তিব্বতী বৌদ্ধগ্রন্থ তাঞ্জুর ও কাপ্পুর ক্রয় করেন।[২৯]

বিশ্বভারতীতে আচার্য লেভি বদান্যতায় চীনা ও তিব্বতী ভাষার চর্চা অব্যাহত থাকে। তিনি ১৯২২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে স্বদেশে ফিরে যান। এরপর ১৯৩৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। আচার্য লেভির বছর খানেক পরে এলেন বিশ্বভারতীর প্রথম চীন অধ্যাপক লিন ও-চিয়াং। তিনি ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত বিশ্বভারতীতে নিয়মিত চীনা ভাষার অধ্যয়ন চলত। সে সময়ে অধ্যাপক লিন ও-চিয়াং সাথে কিছু ছাত্র ও অধ্যাপকও এই ভাষা শিক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন।

বৌদ্ধপ্রধান দেশ শ্রীলংকা। সেখানে রবীন্দ্রনাথ তিনবার এসেছিলেন। ১৯২২ সালের তিনি শেষের দিকে শ্রীলংকা প্রথমবার আসেন। এই যাত্রায় রবীন্দ্রনাথের সফরসঙ্গী ছিলেন দীনবন্ধু এন্ড্রুজ। সেখানে কবিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এবারে শ্রীলংকায় বিভিন্ন স্থানে কবি যে সকল ভাষণ দেন তার মধ্যে Forest University of India ও The Growth of My Life's Work অন্যতম।[৩০] তিনি ভাষণে ভারতীয় শিক্ষাভাবাদর্শ এবং শান্তি নিকেতনের আপন রূপ শ্রীলংকাবাসীদের সামনে তুলে ধরলেন।

বহুকাল ধরে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজ শাসনামলে সিংহলবাসীরা পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হয়ে তাদের নিজস্ব শিল্প সভ্যতা ও ধর্ম অনেকটা অবহেলিত। এই সংকটাপন্ন মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে এসেছেন। তিনি মনে করেন ভারত ও শ্রীলংকা রাষ্ট্র পৃথক হলেও ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সুপ্রাচীন কাল থেকে এক। শ্রীলংকা

বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির বিকাশের উৎপত্তিস্থল। রবীন্দ্রনাথ দুই দেশের সংস্কৃতিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন, যা সংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠায় তার বহিঃপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের আদর্শ ব্যাখ্যা করেন এবং তাদেরকে শান্তিনিকেতনে আসার অনুরোধ করেন। ১৯২৮ সালে বিলাত যাওয়ার সময় রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বারও শ্রীলংকা ভ্রমণ করেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে বিলাতে যাওয়ার সুযোগ হয়নি, সেখান থেকেই তিনি দেশে ফিরে আসেন। শ্রীলংকায় অবস্থান করার সময় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা অবতারণা হলো। শ্রীলংকার রাজধানী মহাতীর্থ নামে খ্যাত অনুরাধাপুরে বুদ্ধপূর্ণিমা উৎসব চলছিল। এই উৎসবটি বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে অনুরাধাপুরের পবিত্র বোধিদ্রুমতলে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীলংকাবাসীদের জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ মহোৎসব হিসেবে খ্যাত। রবীন্দ্রনাথ শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও সেই উৎসবে যোগদান করেন এবং সেদিন লক্ষ লক্ষ শ্রীলংকাবাসী এক হয়ে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধের প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন; যা উৎসবের স্মৃতি শ্রীলংকাবাসীর মনে অনেকদিন জাগ্রত ছিল।[৩১] ১৯৩৪ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় শ্রীলংকায় আসেন। এটি তার তৃতীয়বার আসা। এবার কবির সাথে শান্তিনিকেতনের বহু শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী ছিলেন। এখানে আসার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বভারতীর আদর্শ তাদের কাছে তুলে ধরা। এবার শুধু আদর্শ প্রচার নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি যাতে শ্রদ্ধাশীল হয় সেই উদ্দেশে শ্রীলংকা 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যের অভিনয় ও ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। ভারতীয় সংগীত, নৃত্যকলা ও চিত্রশিল্প প্রদর্শনের মাধ্যমে শ্রীলংকা এক নূতন জগতের সংস্কৃতির নবচেতনার সঞ্চার হয়। শ্রীলংকা বহু প্রাচীন সংস্কৃতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায়। এই প্রসঙ্গে প্রবাসী পত্রিকা লিখেছে;

> *'ধর্মে সভ্যতায় সংস্কৃতিতে ভারতবর্ষের সহিত সিংহলের যোগ বহু প্রাচীন। রবীন্দ্রনাথের সিংহল ভ্রমণ সেই যোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিল। এই কাজটি তাহার দ্বারা যে প্রকারে হওয়া সম্ভব অন্য কোন এক ব্যক্তির দ্বারা তাহা হইতে পারে না।--- নানাগুণের সমাবেশ একই ব্যক্তিতে থাকায় রবীন্দ্রনাথ সিংহলবাসীদিগকে যেমন আনন্দ দিতে পারিয়াছেন ও তাহাদের মধ্যে যে নবজাগরণ আনিয়াছেন তাহা পূর্বে তথায় সংশোধিত হয় নাই'।*[৩২]

চীন ও ভারত প্রাচ্যের দুই প্রতিবেশী। রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণ অনেক আগে ইচ্ছা ছিল। প্রাচীনকাল থেকে দুই দেশ ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। চীনের সাথে রবীন্দ্রনাথের গভীর সম্পর্ক ছিল যা জাপানের হাতে চীনের প্রতি উগ্র সাম্রাজ্যবাদে প্রতিবাদে তীব্র ধিক্কার তাই প্রকাশ পায়। আরো দেখা যায় সিলভা লেভির আগমনে বিশ্বভারতীতে চীনাভাষা চর্চার মাধ্যমে। চীনদেশে ভারতীয় বিভিন্ন বুদ্ধের মূল্যবান ব্যবহার্য সম্পদ সংরক্ষিত আছে, যা কবির মনে চীন ভ্রমণে আগ্রহ পায়। ১৯২৪ সালের ২১শে মার্চ কবি চীন যাত্রা করেন। তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে প্রতিনিধি ছিলেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, আচার্য নন্দলাল বহু ও ডক্টর কালিদাস নাগ।

আরো ছিলেন কবির অনুরাগী এলমহার্স্ট। ১০ই এপ্রিল কবিসহ হংকং বন্দরে অবতরণ করেন এবং বিপ্লবী নেতা ডক্টর সুন ইয়াৎ-সান কবিকে ক্যান্টনে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু সময়াভাবে কবি সে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে ১২ই এপ্রিল হংকং থেকে সাংহাই বন্দরে অবতরণ করলে কবিকে বিপুল অভ্যর্থনা দেওয়া হয়। কবি অভিভাষণে বলেন; 'মহাচীনের সহিত মহাভারতের মৈত্রী ও প্রেমের ধারাকে পুনরুজ্জীবনের ব্রত নিয়ে তিনি এদেশে এসেছেন কোনো রাজনৈতিক স্বার্থে নহে'।[৩৩]

যখন সাংহাইয়ে অবস্থান করার সময় হাংচৌ থেকে আমন্ত্রণ আসে কবি সেখানে তিন দিন ছিলেন। হাংচৌতে প্রাচীন বৌদ্ধ-গুহা ও মন্দির সন্ধান পান। প্রাচীন বৌদ্ধ-গুহা ও মন্দিরে বৌদ্ধভিক্ষুরা ধ্যান সাধনা করেন। হাংচৌ-এ অনুষ্ঠিত সভায় কবি এই ভারতীয় সাধকের উল্লেখ করে বলেন, বোধিজ্ঞান চীনের সংস্কৃতির সহিত আপনার সাধনাযোগে চীনকে যে অমূল্য সম্পদ দান করেছেন তার স্মৃতি এখনো চীনদেশে উজ্জ্বলভাবে জাগ্রত রয়েছে। কবি আশা করেন, অতীতের সাধন যেমন ভারত ও চীনকে একসূত্রে বেঁধে দিয়েছিল, তেমনি অদূর ভবিষ্যতেও উভয় দেশকে আবার প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করতে সহায়ক হবে।[৩৪]

সাংহাইতে আবার ফিরে এলেন কবি। পিকিং ভ্রমণের আগে পঁচিশটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান একযোগে কবিকে সংবর্ধনা দেন। কবি নানকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেন। ২৩শে এপ্রিল কবি ট্রেনযোগে পিকিং এলে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ চীনানাগরিকগণ কবিকে সম্মান জানালেন। সেখানে বিভিন্ন সংবর্ধনা সভায় ভাষণ দেন। সে ভাষণের মধ্যে তিনি চীন ও ভারতের প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের সংস্কৃতির অমৃতধারা তুলে ধরতেন, যা চীনদেশে আজও প্রবহমান। চীন হতে চৈনিক পরিব্রাজকগণ এসেছেন ভারতে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা অর্জন করতে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও চীনবাসীকে বিশ্বভারতীতে আহ্বান জানালেন। পিকিংয়ে অবস্থানকালীন চীনের নির্বাসিত মাঞ্চু সম্রাট কবিকে প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ডক্টর হু-সি প্রাসাদে সম্মান লাভ করেন। কবিকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁর হাতে মহামূল্যবান বুদ্ধমূর্তি উপহার দেন।[৩৫] কবির জন্মদিনে ক্রেসেন্ট মুন সোসাইটির আয়োজনে চীনা সংস্কৃতির আদলে এক উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর হু-সি। সেদিন কবিকে চু-চেন্-তান্ উপাধি প্রদান করা হয়। চু-চেন্-তান্ অর্থ 'ভারতের বজ্রঘোষিত প্রভাত'। অন্য অর্থে এই নাম ভারত ও চীনের ঐক্য এবং মিলনের প্রতীক।[৩৬]

জন্মদিনে এই শ্রদ্ধা ও প্রীতির কথা স্মরণ করে কবি লিখেছেন;

একদা গিয়েছি চিনদেশে,
অচেনা যাহারা ললাটে দিয়েছে চিহ্ন 'তুমি আমাদের চেনা' বলে।
খসে পড়ে গিয়েছিল কখন পরের ছদ্মবেশ; দেখা দিয়েছিল তাই অন্তরের নিত্য যে মানুষ
অভাবিত পরিচয়ে

আনন্দের বাঁধ দিল খুলে।
ধরিহু চিনের নাম, পরিহু চিনের বেশবাস।
এ কথা বুঝিহু মনে,
যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে।[৩৭]

জোসেপ তুচ্চি একজন বৌদ্ধশাস্ত্র পণ্ডিত। যিনি ১৯২৫ সালে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের হতে তৎকালীন ইতালি সরকারের অনুপ্রেরণায় বিশ্বভারতীতে যোগদান করেন। বিশ্বভারতীতে যোগদানের পর সরকার সমস্ত ব্যয়ভারের দায়িত্ব নেন। ইতালির তৎকালীন সর্বময়কর্তা মুসোলিনী ভারতের সাথে মৈত্রী ও সৌহার্দ স্থাপনে অধ্যাপক ফর্মিকিকে বিশ্বভারতীতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ভারতের ইতালির সাংস্কৃতিকে সুদৃঢ় করার জন্য মুসোলিনী অধ্যাপক ফর্মিকিকে বিশ্বভারতীতে একসেট পুস্তকসম্ভারও দান করেন।[৩৮] ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথ মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বালি প্রভৃতি অনেকগুলি দ্বীপ নিয়ে এই দ্বীপময় আকাঙ্ক্ষা ভারত ভ্রমণ করেন। এই প্রাচীন ইতিহাস দ্বীপগুলো ভারতে সংস্কৃতির সাথে জড়িত। কবির মনে আজ আকাঙ্ক্ষা জেগেছে ভারতের বাইরেও ভারতকে বড় করে সন্ধান করতে। ভারত পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত বিদায় সংবর্ধনায় কবি বলেন;

> *'ভারতবর্ষ যে কোন্‌খানে সত্য, নিজের লোহার সিন্দুকের মধ্যে তার দলিল সে রেখে যায় নি। ভারতবর্ষ যা দিতে পেরেছে তার দ্বারাই তার প্রকাশ। এইজন্যেই ভারতবর্ষের সত্যের ঐশ্বর্যকে জানতে হলে সমুদ্রপারে ভারতবর্ষের সুদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয়'।*[৩৯]

১৯২৭ সালের ১৪ই জুলাই কবি মাদ্রাজ হয়ে জাহাজে করে ভারত আসেন। কবির সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর ও ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ। এছাড়াও কবির সাথে মালয় যাত্রায় শ্রী আরিয়াম উইলিয়ামস্‌ও ছিলেন। পরবর্তী সময়ে মালয় থেকে জাভায় দ্বীপে গিয়েছিলেন, সেখানেও যুক্ত হয়েছিলেন শ্রীযুত বাকে ও তার পত্নী। ১৯২৭ সালের ২০শে জুলাই কবি সফরসঙ্গীদের নিয়ে সিঙ্গাপুরে অবতরণ করেন। এখানে আসার পরের দিন গার্ডেন ক্লাবে কবিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। কবি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বলেন; *'চীনের প্রাচীন সংস্কৃতি ও চীনের প্রাণের মধ্যে যে সার্বভৌম মানবিকতার বিকাশ হয়েছিল তাকে তিনি অন্তরের সহিত ভালোবাসেন। আর ভারত ও চীন এই দুই প্রাচীন মিত্রজাতির মধ্যে পুনরায় যোগসূত্র স্থাপন করাই তার হৃদয়গত আকাঙ্ক্ষা'।*[৪০]

১৯২৭ সালের ২২শে জুলাই কবি সিঙ্গাপুরের ভিক্টোরিয়া থিয়েটারে বক্তৃতা করেন– "সমস্ত সিঙ্গাপুর যেন ভেঙে পড়েছিল, কবির বক্তৃতা শোনার জন্য। ইউরোপীয় প্রচুর ছিল, আর ছিল চীনে, আর ভারতবাসী। শ্যর হিউ ক্লিফর্ড কবিকে জনসমক্ষে স্বাগত করে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কবি তখন তার বিশ্বভারতীর সহানুভূতিপূর্ণ জ্ঞানের আদর্শ, আর স্বার্থের প্ররোচনায় পরস্পরের প্রতি হিংসাশীল জগতের নানা জাতির মধ্যে শান্তি আনবার

জন্য ওই আদর্শের উপযোগিতা নিয়ে বক্তৃতা দিলেন। রাষ্ট্রনৈতিক আর অর্থনৈতিক জীবনে আপাতত : ঐক্য আর শান্তির আশা দেখা যাচ্ছে না। নানাজাতির মানুষের মধ্যে মনের মিলের একটি মাত্র পথ এখন খোলা আছে, সেটি হচ্ছে– সমগ্র মানবসভ্যতা একটি অখণ্ড বস্তু, এই বোধ নিয়ে পরস্পরের সভ্যতা আর কৃতিত্ব জানবার আর বোঝবার চেষ্টা করা; এইরূপ জানা থেকেই শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়; আর এই শ্রদ্ধাই হচ্ছে আকর্ষণের আর পরস্পরের প্রতি ন্যায়াচরণের মূল। কবির এই বক্তৃতাটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক আর চিন্তোত্তেজক হয়েছিল।[৪১]

একদিন এক বাড়িতে কবি সবার সাথে আলাপ করছেন। এমতাবস্থায় পাশের বাড়ির চীনা মহিলারা 'ভারতবর্ষ থেকে আগত ধর্মগুরুকে দর্শন করতে চান। কবির সম্মতি পেয়ে বাড়ির বৃদ্ধাসহ পরিবারের সবাই কবিকে প্রণাম করলেন। বৃদ্ধা শুনেছেন যে, ভগবান বুদ্ধের দেশ ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন। বৃদ্ধা নিজেও বুদ্ধভক্ত তাই বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তিস্থল ভারতবর্ষ থেকে আগত কবিকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য উপস্থিত হয়েছেন।[৪২] কবি ১৯২৭ সালের ২৪শে জুলাই সিঙ্গাপুরের স্বনামধন্য 'প্যালেস গে থিয়েটারে' চীনা শিক্ষক ও ছাত্র সমাবেশে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। চীনদেশের কনসান সে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। কবি সেদিন তাঁদের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দেন আচার্য সুনীতিকুমার তার চৌম্বক অংশ লিখেছেন এভাবে;

> *'চীনে মানবিকতার যে বিকাশ হয়েছিল, ভারতবর্ষ প্রাচীন কালে তার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আর ধর্মপ্রচারকদের হাত দিয়ে নিজের আধ্যাত্মিক জগতের, নিজের দর্শন আর চিন্তার নিজের বিজ্ঞানের আর কলার অবিনশ্বর সমৃদ্ধির ভাগ, চীনের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তার সেই মানবিকতারই সংবর্ধনা করেছিল। কবির ভারতীয় পূর্বজগণ চীনে যে এই আধ্যাত্মিক অভিযান করেছিলেন, বহু দূরের অনাগত কালের কবিও তখন তাঁদের মধ্যে এই অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন। গতবার যখন কবি চীনে যান, তখন এই বোধটি তার কাছে যেন একটি উপলব্ধ সত্য হয়ে উঠেছিল'।*[৪৩]

কবি সদলে এখানে সপ্তাহকাল অবস্থানের পর ২৬শে জুলাই মালাক্কায় চলে আসেন। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করে তিনি ১৭ই আগস্ট ইতিহাস সমৃদ্ধ সুমাত্রা বা সুবর্ণদ্বীপে অবস্থান করেন। বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার এক প্রধান কেন্দ্র সুবর্ণদ্বীপ, বৌদ্ধধর্মের সংস্কৃতির জ্ঞানভান্ডার। এখানে বৌদ্ধ শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজারা যবদ্বীপ, মালয় ও দক্ষিণ শ্যাম পর্যন্ত নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেন। ইৎ-সিঙে ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এখানে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আসতেন। এছাড়াও ভারতবর্ষ থেকে অনেকে শিক্ষা অর্জন করতে আসতেন। বাঙালি সূর্যসন্তান অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সুবর্ণদ্বীপে এসে আচার্য চন্দ্রকীর্তির কাছে মহাযানী বৌদ্ধধর্ম বিষয়ের উপর শিক্ষা অর্জন করতেন। শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্রদেব নালন্দা বিহারে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মঠটি পরিচালনার জন্য অনুরোধ করেন পালরাজ দেবপালকে। ভারত ও সুবর্ণদ্বীপের সাথে সংস্কৃতি শিক্ষা অর্জনে গভীর যোগাযোগ ছিল।

সুমাত্রায় যবদ্বীপে একদিন কবির মনে এক বিস্মৃত মিলনের কাহিনী, যেদিন এই দ্বীপের সঙ্গে ভারতের প্রাণের মিল হয়েছিল। এই দূর সাগরের উপকূল পরিদর্শনে কবি আবার এসেছেন। যবদ্বীপকে উদ্দেশ্যে করে 'শ্রীবিজয় লক্ষ্মী' কবিতাটি রচনা করেন। এটির সাথে ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক মৈত্রীর মেলবন্ধনের এক অপূর্ব চিত্র ফুটে উঠেছে।

এবার আবার ডাক শুনেছি, হৃদয় আমার নাচে,
হাজার বছর পার হয়ে আজ আসি তোমার কাছে।
মুখের পানে চেয়ে তোমার আবার পড়ে মনে
আরেক দিনের প্রথম দেখা তোমার হামল বনে।
হয়েছিল রাখীবাঁধন সেদিন শুভ প্রাতে,
সেই রাখি যে আজো দেখি তোমার দখিন হাতে।
এই যে-পথে হয়েছিল মোদের যাওয়া-আসা
আজো সেথায় ছড়িয়ে আছে আমার ছিন্ন ভাষা।
সে চিহ্ন আজ বেয়ে বেয়ে এলেম শুভক্ষণে
সেই সেদিনের প্রদীপজ্বালা প্রাণের নিকেতনে।
আমি তোমায় চিনেছি আজ, তুমি আমায় চেনো,
নূতন পাওয়া পুরানোকে আপন বলে জেনো।[৪৪]

২১শে আগস্ট রবীন্দ্রনাথ যবদ্বীপের তাজোঙ প্রিয়োক বন্দরে এলে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। পরদিন সন্ধ্যায় কনসাল মিস্টার ক্রসবির বাড়িতে ভোজসভার আয়োজন করা হয় এবং তাঁর আগ্রহে কবি 'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী' কবিতার ইংরেজি অনুবাদ The Indian Pilgrim to Java পাঠ করে শোনান।

রবীন্দ্রনাথ যবদ্বীপ থেকে বালিদ্বীপের বাংলি নামক স্থানে গিয়ে দেখেন রাজবংশের কারো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে এক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে; 'রাজপুরীতে প্রবেশ করেই দেখেন প্রাঙ্গণে একটি বেদীর উপর বিচিত্র উপকরণ সাজানো; এখানকার চারজন ধর্মবেত্তা একজন বুদ্ধের, একজন শিবের, একজন ব্রহ্মার, একজন বিষ্ণুর পূজারীকে দেখেন। এরা চারজন পাশাপাশি বসে আপন আপন দেবতার সবমন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন। পরে শোনা গেল, এই মাঈল্যমন্ত্রপাঠ চলছিল রাজবাড়িতে কবির আগমন উপলক্ষে'।[৪৫]

কবি বালিদ্বীপে আরো কয়েকটি স্থান ভ্রমণ করে মুগ্ধ হয়েছেন এবং বালিদ্বীপকে কেন্দ্র করে 'সাগরিকা' শীর্ষক সুন্দর কবিতা রচনা করেন। পরবর্তী সময়ে এটি 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়।

কবি বালিদ্বীপ থেকে যবদ্বীপে আবার ফিরে এলেন। যবদ্বীপ স্থানটি হলো সুরাবায়াত। এখানে কবিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এরপর কবি সদলে বিশ্ববিখ্যাত বোরোবুদুর বৌদ্ধমন্দির দর্শন করতে গেলেন। অষ্টম শতকে সুমাত্রার শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় মন্দিরটি নির্মিত হয়। এটি ছাড়াও ছোটবড় আরো অনেক মন্দির নির্মাণ করেন যা ভারতীয় শিল্পসৌন্দর্যের প্রকাশে বোরোবুদুর মন্দিরকে সমৃদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথের বোরোবুদুর দর্শন উপলক্ষে আচার্য সুনীতিকুমার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা এখানে উলেখযোগ্য :

> *'বোরোবুদুরের মতন বিরাট শিল্প নিকেতনের সৌন্দর্য-সম্ভারের মধ্যে, প্রাচীন ভারতের জীবন্ত প্রাণের স্পন্দনে সৃষ্ট এই অবিনশ্বর কীর্তির আবেষ্টনের মধ্যে দন্ডায়মান, ভারতের শ্রেষ্ঠ রসস্রষ্টাদের মধ্যে অন্যতম শ্রীরবীন্দ্রনাথ; যে ভারতের ঋষিদের, যে ভারতের বুদ্ধের সাধনার অনুপ্রাণনার ফলে এই বোরোবুছর, এই প্রাস্বানান, সেই ঋষিদের সেই বুদ্ধের বাণী নবীন-ভাবে যিনি জগতে প্রচার করেছেন, প্রাচীন ঋষিদের সেই অদ্ভুত কর্মা বংশধর এ রবীন্দ্রনাথ, তিনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত। ভারতের প্রাচীন প্রতিভার লীলাক্ষেত্রে এসেছেন ভারতের আধুনিক যুগের এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ, প্রাণরসের উৎসের সন্ধানে; দৃশ্য অপূর্ব; রবীন্দ্রনাথের এই তীর্থে আগমনে, যেন তাঁর দ্বারাই ভারতের প্রাচীন পিতৃপুরুষগণের আন্নার উদ্দেশে, তাদের এক বিশেষ কৃতিত্ব বা কীর্তি স্মরণ করে, শ্রদ্ধা নিবেদন করা হল। বোরোবুদুর-রবীন্দ্রনাথ; ভারতের শাশ্বত চিন্তা আর কল্পনাশক্তির দুইটি বিরাট প্রকাশ-এক দিকে ভাস্কর্যমূর্তি সৌধে, অন্য দিকে অলৌকিক কবি-প্রতিভায়' ।*[৪৬]

কবি বোরোবুদুর মন্দির দর্শনে তাঁর মধ্যে অনুরাগ সৃষ্টি হয়েছে, যা লেখনীতে প্রকাশ করেছেন। মন্দিরে পাষাণের সংগীতের তানে বুদ্ধের বন্দনামন্ত্র রচিত হয়েছিল। মানুষ আজ শুধু বাসনার তাড়নায় লক্ষ্যহীনভাবে ছুটে চলেছে।

ক্ষিপ্রগতি বাসনার তাড়নায় তৃপ্তিহীন ত্বরা,
কম্পমান ধরা;
বেগ শুধু বেড়ে চলে ঊর্ধ্বশ্বাসে মৃগয়া-উদ্দেশে,
লক্ষ্য ছোটে পথে পথে, কোথাও পৌঁছে না পরিশেষে;
অন্তহারা সঞ্চয়ের আহুতি মাগিয়া
সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া;
তাই আসিয়াছে দিন,
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,

আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে
শুনিবারে
পাষাণের মৌনতটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র– 'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।[৪৭]

যবদ্বীপ থেকে কবি ৮ই অক্টোবর রওনা হলেন শ্যামের পথে। স্বল্প সময়ে ব্যাংকক নগরীতে উপনীত হন। সেখানে শ্যাম সরকার কবি ও তার সঙ্গীগণ প্রসিদ্ধ 'ফ্যা থাই প্যালেস হোটেলে' থাকার ব্যবস্থা করেন। এখানে আসার পর কবি প্রথমে শ্যামের শিক্ষামন্ত্রী রাজকুমার ধনীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং শান্তিনিকেতনের শিক্ষানীতি ও সামগ্রিক বিষয়ে দুজনের মধ্যে আলোচনা হয়। আবার সেদিন সন্ধ্যায় কবি সদলে ব্যাংককের প্রসিদ্ধ Wat Rat-bophit বা রাজপবিত্র মন্দিরের প্রধান ধর্মগুরুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। শ্যামের রাজগুরু কবিকে সম্মান জানান। কবিও প্রধান ধর্মগুরুর সাক্ষাতে আনন্দ লাভ করেন।[৪৮] ১২ই অক্টোবর কবি বজ্রায়ুধ স্কুলে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং কবিকে শ্রেষ্ঠ 'ধর্মাসন' দান করা হয়। এর পরের দিন কবি চূলালংকরণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। সেদিন কবির কণ্ঠে বুদ্ধদেবের মৈত্রী ও করুণার বাণী উচ্চারিত হয়।[৪৯] উপস্থিত শ্রেতৃমণ্ডলী কবির বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়েছেন। বৌদ্ধসংস্কৃতি ও বুদ্ধমূর্তি সৌন্দর্য শ্যামবাসীর পুলকিতমন কবিকে করেছে বিমোহিত। কবি শ্যামদেশকে উপলক্ষ করে বলেন;

আমি সেথা হতে এনু যেথা ভগ্নস্তূপে
বুদ্ধের বচন রুদ্ধ দীর্ণকীর্ণ ঘৃক শিলারূপে
ছিল যেথা সমাচ্ছন্ন করি
বহু যুগ ধরি
বিশ্বতিকুয়াশা
ভক্তির বিজয়স্তম্ভে সমুৎকীর্ণ অর্চনার ভাষা।
সে-অর্চনার সেই বাণী
আপন সজীব মূর্তিখানি
রাখিয়াছে ধ্রুব করি শ্যামল সরস বক্ষে তব–
আজি আমি তারে দেখি লব–

ভারতের যে-মহিমা
ত্যাগ করি আসিয়াছে আপন অঙ্গনসীমা
অর্ঘ্য দিব তারে
ভারত-বাহিরে তব দ্বারে।
স্নিগ্ধ করি প্রাণ
তীর্থজলে করি যাব স্নান
তোমার জীবনধারাস্রোতে,
যে-নদী এসেছে বহি ভারতের পুণ্যযুগ হতে
যে-যুগের গিরিশৃঙ্গ-'পর
একদা উদিয়াছিল প্রেমের মঙ্গলদিনকর।[৫০]

একদিন রাজপ্রাসাদে রাজা ও রানীর সাক্ষাৎকালে কবি শ্যামদেশের উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখে তাঁদের উপহার দেন। পরবর্তী সময়ে কবি শ্যামদেশে সপ্তাহকাল অবস্থান করে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন এবং বিদায়কালে শ্যামদেশের উদ্দেশ্যে বলেন;

চিরন্তন আত্মীয়জনারে
দেখিয়াছি বারে বারে
তোমার ভাষায়,
তোমার ভক্তিতে, তব মুক্তির আশায়,
সুন্দরের তপস্যাতে
যে-অর্ঘ্য রচিলে তব সুনিপুণ হাতে
তাহারি শোভন রূপে
পূজার প্রদীপে তব, প্রজ্বলিত ধূপে।
আজি বিদায়ের ক্ষণে
চাহিলাম স্নিগ্ধ তব উদার নয়েনে,
দাড়ানু ক্ষণিক তব অঙ্গনের তলে,
পরাইনু গলে
বরমাল্য পূর্ণ অনুরাগে–
অম্লান কুসুম যার ফুটেছিল বহুযুগ আগে।[৫১]

কবি এশিয়ার বৌদ্ধধর্ম অধ্যুষিত দেশসমূহ ভ্রমণ করে ভারতের বৌদ্ধধর্ম ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে যেভাবে তুলে ধরেছেন সেটি একটি বিশেষ অবিস্মরণীয় ঘটনা যা বুদ্ধের মৈত্রীর বাণীতে সমগ্র এশিয়াতে নতুনভাবে উদ্ভাসিত

হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের এশিয়া ভ্রমণের মূলেও ছিল মৈত্রী ও প্রেমের আদর্শকে মানুষের অন্তরকে জাগ্রত করা। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাই বলা হয়, বুদ্ধের আদর্শের উত্তরসূরি রবীন্দ্রনাথ।

১৯২৮ সালে অধ্যাপক তান যুন-শান (১৯০০-৮৩) শান্তিনিকেতনে আসেন। বিশ্বভারতীর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। বিশ্বভারতীতে চীনাভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র-চর্চার হতো। তান যুন-শান কবির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি কবির প্রতি আরো গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। তান খুন-শান বুদ্ধ ও তার জন্মভূমির প্রতি একান্ত ভক্ত। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তিনি বুদ্ধের আদর্শের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পান এবং তার মনে কবির জীবনাদর্শে সংকল্পবদ্ধ হলেন।

তান যুন-শানের আসার পর চীন, তিব্বত ও মঙ্গোলিয়া থেকে বিশ্বভারতীতে অনেক ভিক্ষু, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা আসেন। যার জন্য বিশ্বভারতীতে চীনা ও তিব্বতী ভাষার চর্চা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৩৩ সালে তান যুন-শান রবীন্দ্রনাথের মহৎ প্রেরণায় Sino-Indian Cultural Society বা চীন-ভারত সংস্কৃতি পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৩৪ সালে অধ্যাপক তান ভারতে ফিরে এসে সেখানেও এ পরিষদ গঠন করেন। শান্তিনিকেতন হলো সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রধান কেন্দ্র। অধ্যাপক তান ত্যাগ, কর্মনিষ্ঠা ও চীন ভবনের সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে মনে করা হয় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী এক নবজাগরণের নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি।[৫২] ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে অধ্যাপক তান দেশে ফিরে গেলেন এবং সাথে ছিল চীনবাসীর প্রতি কবির মৈত্রীপূর্ণ চিঠি। রবীন্দ্রনাথ চীন ও ভারতবাসীকে মৈত্রীবন্ধন সম্বোধন করে যে পত্র লিখেন;

> My friends in China,
>
> The truth that we received when your pilgrims came to us in India and ours went to you-that is not lost even now, what a great pilgrimage was that! What a great time in history! It is our duty to day to revive the heroic spirit of that pilgrimage, following the ancient path which is not merely a geographical one but the great histoeical path that was built across the difficult barriers of race difference and difference of language and tradition,reaching the spiritual home where man is in bonds of love and cooperation.[৫৩]

অর্থাৎ, ভারত ও চীনের ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে যে সত্য উপলব্ধি করেছিলাম তা আজও ইতিহাসের পরম লগ্নে এক মহান তীর্থযাত্রা। সেদিন জাতি, ভাষা ও ঐতিহ্যের গণ্ডি পেরিয়ে মানুষে মানুষে সহযোগিতা ও প্রেমের সেতুবন্ধন রচিত হলো। প্রাচীন ঐতিহ্যেকে অনুসরণ করে আজ আমাদের অতীত মহান আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে হবে। অধ্যাপক তান চীনবাসীর কাছে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ ও অমূল্য গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন।

এরপর ১৯৩৬ সালে শান্তি নিকেতনে ফিরে আসেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে ১৩৪৪ বাংলা নববর্ষে দিনে বিশ্বভারতীতে 'চীনভবন' প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৪] সেদিন চীনভবন প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব ভারতীতে তিব্বত, চীন, জাপান, সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যাম প্রভৃতি দেশ থেকে শিক্ষানুরাগীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠায় যেন নালন্দার হারানো ঐতিহ্য সমুজ্জল হলো।[৫৫] রবীন্দ্রদৃষ্টিতে বুদ্ধের প্রভাব যে পরিলক্ষিত হয় তা ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি অনুধাবনে বোঝা যায়। এসকল ঘটনা তাঁর চিন্তা ও কল্পনাশক্তিকে নবরূপে প্রেরণা সৃষ্টি করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলেছেন বৌদ্ধসংস্কৃতির জাগরণে বাংগালি সংস্কৃতির এক অনন্য ভূমিকা রয়েছে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র শ্রীলংকায় গমন করে বৌদ্ধধর্মের আদর্শ আয়ত্ত করেন যা তাঁর মনে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাথে শ্রীলংকায় গিয়েছিলেন। বুদ্ধগয়া থেকে ফিরে আসার তিন মাস পরে 'শাক্যসমাগম' (১৮৮০) অনুষ্ঠান এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় চেতনায় বৌদ্ধভাবধারা ও বুদ্ধচর্চার প্রতি আগ্রহবোধ জাগ্রত হয়। কেশবচন্দ্রের নির্দেশ সাধু অঘোরনাথের 'শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব' (১৮৮২) রচিত প্রথম গ্রন্থ। বাংলাসাহিত্যে জগতে বুদ্ধের জীবন প্রবাহে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। সাধু অঘোর নাথের বুদ্ধচর্চার সূচনার পাশাপাশি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, কালীশঙ্কর দাস, কৃষ্ণবিহারী সেন, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও বিনয়েন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ মনীষীবৃন্দের নাম স্মরণীয়।

কেশবচন্দ্রের সাথে ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। ঠাকুর পরিবারের সাথে কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ ছিল। ১৮৬৫ সালে 'নব নাটক' রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাথে বন্ধুত্ব আরো ঘনীভূত হয়। ১৮৮২ সালে 'সারস্বত সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে সভাপতি ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, যুগ্ম সম্পাদক হন কৃষ্ণবিহারী ও রবীন্দ্রনাথ। আবার ১৮৯১ সালে রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'সাধনা' পত্রিকার লেখক ছিলেন কৃষ্ণবিহারী। এরপর 'বুদ্ধচরিত' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৮৯২ সালে কৃষ্ণবিহারীর প্রসিদ্ধ 'অশোকচরিত' গ্রন্থখানিও প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা রয়েছে। বাঙালি নবজাগরণে বুদ্ধচেতনার সঞ্চারের পেছনে শ্রীলংকার বৌদ্ধ পণ্ডিত অনাগারিক ধর্মপালের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ১৮৯১ সালে ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মের মর্মবাণী প্রচারে কলকাতায় আসেন। ১৮৯১ সালে তিনি কলকাতায় মহাবোধি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং মুখপত্র মহাবোধি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৯৩ সালে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে শিকাগো মহাধর্মসভায় যোগদান করে এবং বিশ্বে বৌদ্ধধর্মে বাণীকে তুলে ধরলেন। শিকাগো ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দের সাথে তার দেখা হয়। এর ফলে প্রাচ্যের এই দুই তরুণ ধর্মনেতা আজীবন এক প্রগাঢ় প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হন। বিবেকানন্দ ও ধর্মপালকে একত্রে উল্লেখ করে ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন;

‘বিবেকানন্দ বিলাতে যদি বেদান্ত প্রচার করেন এবং ধর্মপাল যদি সেখানে ইংরেজ বৌদ্ধসম্প্রদায় স্থাপন করেন, তাহাতে য়ুরোপের গায়ে বাজে না। পূর্বদেশে তাহার বিপরীত। প্রাচ্য সভ্যতার কলেবর ধর্ম।

শ্রীলংকা অনাগরিক ধর্মপাল শিকাগো থেকে কলকাতায় ফিরে এসে ভারতে বুদ্ধচেতনায় নূতনভাবে প্রেরণা সৃষ্টি হয়। সে সময় থেকে দেশে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধের জন্মোৎসব পালনের রীতি প্রচলিত হয়। এই জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের ‘হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি’ ও ‘সকল কলুষতামস হর’ গান দুটি রচিত হয়। এই গানে বুদ্ধের মৈত্রী-করুণার বাণী ফুটে ওঠেছে। ধর্মপালের আদর্শের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ সেটি কলকাতার ধর্মরাজিক চৈত্যবিহার (১৯২০) ও সারনাথের মূলগন্ধকুটি বিহার (১৯৩১) ধর্মপালের অমর কীর্তি তা সাক্ষ্য বহন করে। রবীন্দ্রনাথ ১৩৪২ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা উপলক্ষে ধর্মপালের আমন্ত্রণে ধর্মরাজিক চৈত্যবিহারে বৈশাখী পূর্ণিমায় ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই ভাষণে বুদ্ধকে জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। কবি সারনাথের মূলগন্ধকুটি বিহারের দ্বারোদঘাটন উৎসবে একটি কবিতা রচনা করেন। এই কবিতায় জাতীয় জীবনে বুদ্ধের আদর্শও কবির আন্তরিকতার প্রভাব জাগরিত হয়।

ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো তুমি।
বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক, মুক্ত হোক মোহ-আবরণ
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি।[৫৬]

ধর্মপালের পাশাপাশি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছিল রবীন্দ্রনাথের আদর্শের প্রতীক। সত্যেন্দ্রনাথের রচিত সুশ্বেতা, ঘুম-গুম্ফায়, বুদ্ধপূর্ণিমা ও বুদ্ধবরণ কবিতায় প্রমাণ করে। বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ স্থাপনকে উপলক্ষ করে ধর্মপাল কর্তৃক রচিত ‘বুদ্ধবরণ’ কবিতাটি তৎকালীন সময়ে বুদ্ধের প্রতি মৈত্রীভাবের দিকটি বেশি লক্ষ করা যায়।

বঙ্গে এল বুদ্ধ-বিভা, কিন্তু সে নাই বেঁচে,
নগর পুন্ড্র বর্দ্ধনও নেই-স্বপ্ন হয়ে গেছে!
নেই বালিকা উপাসিকা; আমরা তারই হয়ে
বরণ করি বুদ্ধ-বিভা চিত্ত-প্রদীপ লয়ে;
চৈত্য দিয়ে যত্নে ঘিরি বুদ্ধ-বিভূতিরে,

সেদিন বাঙালি চেতনার প্রদীপ বুদ্ধের আদর্শকে পুনরায় বরণ করার অভিপ্রায় হয়েছিল।

১৮৬২ সালে কাকুজো ওকাকুরা জাপানে একটি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকে তিনি লেখালেখির প্রতি বেশি মনোযোগী ছিলেন। পরবর্তী সময়ে চিত্রশিল্পের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায়। তার খুব ইচ্ছা আমেরিকার শিকাগো মহাধর্মসম্মেলনের মতো টোকিও শহরে একটি ধর্মসভা আয়োজন করা। এজন্য বেলুড়ে স্বামী বিবেকানন্দকে জাপানে আনার জন্য কলকাতায় আসেন। প্রথমে তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে রাজি ছিলেন না। স্বামী বিবেকানন্দের ভাগিনী সাথে ওকাকুরার পরিচয় হয়। ১৯০২ সালে নিবেদিতার বদান্যতায় রবীন্দ্রনাথের সাথে ওকাকুরার সাক্ষাৎ হয়। তাঁর Ideals of the East (১৯০৩) গ্রন্থের প্রথম কথা হলো Asia is one অর্থাৎ, আদর্শের দিক থেকে সমগ্র এশিয়া একসূত্রে বাঁধা। চীনদেশের প্রাচীন সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি এবং ভারতীয় শিল্প, সংস্কৃতি ঐতিহ্যের প্রতি সম্পর্ক গড়ে তোলা ওকাকুরার বহু প্রয়াস ছিল। হোরি সানকে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রেরণ তারই প্রমাণ। এছাড়া টাইকান ও হিসিদা দুই শিল্পীকে ভারতীয় শিল্পীদের সাথে কাজ করার জন্য কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মের অভিবৃদ্ধিতে চীন ও জাপানের সাথে ভারতের আধ্যাত্মিক যোগসাধনা সম্পর্ক সুদৃঢ় করাই ওকাকুরার প্রয়াস ছিল। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের আদর্শ তাকে বেশি অনুপ্রাণিত করেছে। ১৯১২ সালে ওকাকুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শেষ সাক্ষাৎ হয় আমেরিকাতে। ১৯১৩ সালে জাপানে তার মৃত্যু হয়। কবি ১৯১৬ জাপানে ওকাকুরার বাড়িতে ছিলেন। কবি গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন যে, ওকাকুরা জাপানি শিল্পসংস্কৃতি জাগরণের মূর্তপ্রতীক, সেটি তারা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে পারেননি।

উপসংহার : ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথের অসীম প্রতিভাধর কাব্য প্রতিভা আর সাহিত্যজীবনের সাধনালব্ধ মননশীলতা সাহিত্যভাণ্ডারে লেখনীর মাধ্যমে বাংলা ও সাহিত্যকে বিশ্বে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। সংকীর্ণতা, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কারের ভেড়াজাল থেকে বের হয়ে বুদ্ধের সাম্যবাদ, উদারতা, সহিষ্ণুতা, মানবতাবাদ, জাগতিক চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠার পেছনে যার অনন্য অবদান সাহিত্যনুরাগী রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক বৌদ্ধসংস্কৃতির বলয়ে আচ্ছন্ন ছিল। রবীন্দ্রনাথের পূর্বেও বৌদ্ধসংস্কৃতির সাথে যোগসূত্র ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'আর্যধর্ম' এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত (১৮৯৯) এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'বৌদ্ধধর্ম' (১৯০১) তাঁর প্রমাণ। ঊনবিংশ শতকের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি নতুন ধারায় নবজাগরণে যে প্রভাব বিস্তারে করেছে, তাঁর অন্যতম অবদান বৌদ্ধ সংস্কৃতিমনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রাচীন ভারতে রবীন্দ্রচেতনায় বৌদ্ধসংস্কৃতির চিরন্তন রূপ সৃষ্টি করেছেন। বুদ্ধের অহিংসা, মৈত্রী, করুণা আর ত্যাগের মহিমায় সিক্ত রসসমৃদ্ধ তাঁর অমিয়বাণীর প্রতি কবির ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা

ও ভালোবাসা। তাঁর প্রমাণ সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরে বিশেষ করে কাব্যে, গীতিতে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে ও নাটকে সেটির আপন মহিমা তুলে ধরেছেন। এদেশের পণ্ডিত সমাজের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র শিক্ষিত সমাজে বৌদ্ধশাস্ত্রকে দৃষ্টিগোচর করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ভারতীয় মনীষী ও বাঙালি দৃষ্টি সে বৌদ্ধসাহিত্য মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেননি। কবির সৃষ্টিশীল ও প্রগতিশীল প্রতিভা ভাস্বরে তা সাহিত্যে মহীয়ান করেছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal হতে উপজীব্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে 'কথা ও কাহিনী' এবং নাটকগুলো রচনা রূপদান করেছেন রবীন্দ্রনাথের রচিত পত্রাবলী ও জীবনীগ্রন্থে। উল্লেখ্য যে-গ্রন্থটি প্রকাশের সাথে সাথে সমগ্র বিশ্বে পণ্ডিত সমাজে বেশ সমাদৃত হয়েছে। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের কাহিনী নিয়ে তাঁর রচিত সাহিত্যেভান্ডারে যেভাবে রূপ ও রস সৃষ্টি করেছে, সাহিত্যবিশারদদের মধ্যে আর কেউ রবীন্দ্রনাথের মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal এর মতো ইউরোপীয় কবি Arnold এর রচিত কাব্যগ্রন্থ Light of Asia অমর প্রতিভা সৃষ্টি। এছাড়াও Rhys Davids, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামদাস সেন, কেশবচন্দ্র সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ, অমোরনাথ গুপ্ত প্রভৃতি সাহিত্যবিশারদদের সাহিত্য প্রতিভা বৌদ্ধ ইতিহাস ও সংস্কৃতি অবদান কোনো অংশে কম নয়। রবীন্দ্রনাথের মতো নাটক রচনার ক্ষেত্রে গিরীশ ঘোষের অবদান অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। অশোক, বুদ্ধ চরিত পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত হয়েছে। সাহিত্য রচনায় ভারতবর্ষে ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের তথ্য সন্ধান পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্যধর্মে আচারনিষ্ঠা ও সংকীর্ণতার পাশে রেখে বৌদ্ধধর্মে আদর্শকে জয়গানে প্রতিফলন ঘটান। কবি ব্রাহ্মণ্যধর্মের চেয়ে বৌদ্ধধর্মের আদর্শকে ব্রত হিসেবে নিয়েছেন। বৌদ্ধধর্মের মহান জীবনাচরণ, গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, মানবতাবাদের সমুজ্জ্বল দ্বীপ্তশিখা, মহামানব বুদ্ধের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রদর্শন, তাঁর রচনায় গভীর ভাবানুরাগে মুদ্ধ করেছে। বুদ্ধের সত্যবাণী ভাবাদর্শে, প্রজ্ঞাসাধনায়,কর্মে, মৈত্রীর অমৃতবাণীর শক্তিতে জীবন ধন্য হয়েছে, কবির অনুভূতিতে তা উপলব্ধি করেছেন। তাই কবি বলেন–

শুনিয়াছি, তারি লাগি রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা বিষয়ে বিরাগী পথের ভিক্ষুক। রবীন্দ্রনাথ বহু প্রতিভার অধিকারী একজন কালপুরুষ। সাহিত্যপ্রতিভায় সমগ্র বিশ্বে বেশ সমাদৃত। তাঁর সাহিত্য পরিধি বিশাল এক জায়গা ধরে রেখেছেন। সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্মীয়, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি এমন কোনো জায়গায় স্পর্শ করেননি, যেখানে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যক্ষেত্রে পদচারণা ঘটেনি। পরিশেষে, ব্রহ্মবিহার চর্চা এবং মানুষকে 'বহুজনের হিতে বহুজনের সুখে' অনুপ্রেরণা প্রদান করার মৈত্রীবাণী কবির অন্তরে গভীরভাবে আন্দোলিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল। কবির পারিবারিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে ছিল বুদ্ধধর্ম-সংস্কৃতিচেতনার লালনক্ষেত্র। কবি

জীবনসাধনার মূল লক্ষ্যে ছিল বুদ্ধের মানবপ্রেম ও সাম্যের মধ্যে বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠা করা, তা আজ সর্বজনবিদিত ঐক্যতত্ত্ব।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ :

১. শ্রী জ্যোতিঃপাল মহাথের, *রবীন্দ্রসাহিত্যে বৌদ্ধসংস্কৃতি*, অন্তিকা প্রেস, চট্টগ্রাম, ১৯৯৭, পৃ. ১।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২।
৩. সুধাংশু বিমল বড়ুয়া, *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, মিলনপল্লী কো-অপারেটিভ, কলকাতা, ১৩৭৪, পৃ. ৪০।
৪. *রবীন্দ্রসাহিত্যে বৌদ্ধসংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২।
৫. *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।
৮. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড* (৩য় সং), বিশ্বভারতী, কলকাতা, (১৯০১-১৯১৮), পৃ. ১০৯।
৯. *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।
১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২১, পৃ. ২১৮।
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯।
১২. *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।
১৩. অমিয়া বন্দোপাধ্যায়, *মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ১২৪।
১৪. *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫১।
১৬. প্রাগুক্ত, *রবীন্দ্রজীবনী' ২য় খণ্ড* (৩য় সং), (১৯০১-১৯১৮), পৃ. ১৫১।
১৭. রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৪০৩।
১৮. 'রবীন্দ্রজীবনী' ৩য় খণ্ড (১ম সং), (১৯১৮-১৯৩৪), পৃ. ৪৫১।
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।
২০. *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।
২৪. 'রবীন্দ্রজীবনী' ২য় খণ্ড (৩য় সং), পৃ. ৪৫৭।
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৭।
২৬. 'রবীন্দ্রজীবনী' ২য় খণ্ড (৩য় সং), পৃ. ৪৫৭।
২৭. 'রবীন্দ্রজীবনী' ৩য় খণ্ড (১ম সং), পৃ. ১৩৯।
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২।
২৯. সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী-চীনভবন*, গীতবিতান পত্রিকা, ১৩৬৮।
৩০. 'রবীন্দ্রজীবনী' ৩য় খণ্ড (১ম সং), পৃ. ১০১।
৩১. প্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীমন্তকুমার জানা, সিংহল ও রবীন্দ্রনাথ, সাপ্তাহিক বসুমতী, ১৩৭২, পৃ. ৩১২২।
৩২. রবীন্দ্রজীবনী' ৩য় খণ্ডে (১ম সং) প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬।
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।

৩৫. জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, 'বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ' (২য় সং), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৬২, পৃ. ১২৪-১২৬।
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।
৩৮. 'রবীন্দ্রজীবনী' ৩য় খণ্ড (১ম সং), পৃ. ১৭১।
৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালান্তর, বৃহত্তর ভারত, ১৯২৭।
৪০. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ, কে. এম. প্রেস, কলকাতা, ১৩৭১, পৃ. ৮১-৮২।
৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭।
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১-১২।
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।
৪৪. *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।
৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।
৪৬. রবীন্দ্র সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ, পৃ. ৫৫৯।
৪৭. সুজিতকুমার বসু (সম্পা.), *রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪১৫।
৪৮. 'রবীন্দ্র সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ', পৃ. ৬০৭।
৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩২।
৫০. রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধসংস্কৃতি, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪১৫, পৃ. ৫৮-৫৯।
৫১. *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।
৫২. সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী-চীনভবন', গীতবিতান পত্রিকা, ১৩৬৮।
৫৩. Tan Yun-Shan, Twenty Years of the Visva-Bharati Cheena-Bhavana (1937-57), Appendix One, p. 2
৫৪. প্রাগুক্ত, রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৬।
৫৫. সুধাংশুবিমল বড়ুয়া, 'বিশ্বভারতীতে বৌদ্ধশাস্ত্র-চর্চা', 'চিত্রাঙ্গদা', ১৩৭৩।
৫৬. *রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩।

চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্র ঠাকুরের নাটকে বৌদ্ধ প্রভাব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রবীন্দনাথের নাট্যকর্মের স্বরূপ অন্বেষণ প্রসঙ্গ : সাহিত্য জগত এক বিচিত্র মাত্রা বিশেষ। গল্প, নাটক, কাব্য, উপন্যাস, গান, প্রবন্ধ এসব নিয়েই সাহিত্যের রূপায়ন। এরই মধ্যে নাটকের একটি বিশেষ রূপ ও শৈল্পিকতা আছে। মানুষের কাছে নাট্যকারের শৈল্পিকতা ও দক্ষতার মাধ্যমে সেটা আপন গতিময়তা ও রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে। গল্পে, উপন্যাসে, গানে, কাব্যে যে শিল্পরীতির ভাব অনুসরণ করে; তা আবার নাটকে ভিন্নতা প্রকাশ পায়। কাব্য, উপন্যাস, গল্প যত সহজ, নাটকে চিত্র ভাব নাট্যকারের মননের নিজস্ব শৈল্পিকতায় তা বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। গীতিকাব্য কবির একান্ত নিজস্ব মনোভাবের উপার নির্ভরশীল। উপন্যাসের পটভূমি বিস্তৃত ও নির্দিষ্ট। কবির সমস্ত লেখনীর ধরনের উপর তার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রূপ লাভ করে। এতে তার অভিব্যক্তির ধারার মাধ্যমে নাট্যকারের কোনো মন্তব্য, স্থান, ঘটনা, বিশ্লেষণই নির্দিষ্ট নাটক। সংলাপ ও কাজের ধরনের উপর নির্ভর করে নাটকের রূপ দান করা হয়। 'নাট্যকারের স্থান নাটকের নেপথ্যে'[১] / নাট্যকারে ভাব কল্পনা ও চিন্তার বিকাশ দানে নাটকের বিশেষ রূপ প্রকাশ পায়। নাটকের ধরন যতই উন্নত হোক না কেন নাট্যকারের চিন্তাশক্তি, কল্পনা, অনুভূতি, তার মানবজগতে যদি সঠিক স্থান না পায় তাহলে নাটকের আপন রূপ ভেসে উঠবে না। নাট্যকারের নাট্যকীয় চরিত্র মনোজগতের আপন চিত্র উদ্ভাসিত হয়। সংলাপের ঘটনার সাথে নাট্যকারের চরিত্রের সঠিক অভিব্যক্তিই আপন রূপ প্রকাশ পায়। শিল্পীয় এই নৈর্ব্যক্তিকতা বা নির্লিপ্ততাই নাট্যসাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। নাটকের বিশেষ দিক হলো ইহা বস্তুধর্ম ও প্রত্যক্ষ জীবনধারা, মানব জীবনকে বাস্তবতায় প্রকৃত ঘটনকে কেন্দ্র করে ভাবগত প্রকৃতি ভাবধারা চিন্তা ও কাজকে সংহত করে। নাটকের প্রকাশ নাট্যচিত্র একটি প্রকৃত ঘটনার মাধ্যমে নাটকে চরিত্রের বিকাশ সাধন হয়। নাটকে ধর্ম, সমাজ, রাাজনীতি, অর্থনৈতিক নীতি আদর্শে অনেকাংশে প্রভাবিত করা হয়। নাটকে সভ্যতা, আর্থ সামাজিক আচরণ মানসিক সংস্থায়, কৃষ্টি, সংস্কৃতির দিক ফুটে তুলে। "ডায়নিসাসের মন্দির অভ্যান্তরে এই বিশাল রঙ্গমঞ্চে উঁচু গোড়ালি বিশিষ্ট চামড়ারজুতা, মুখোশ ও কৃত্রিম দীর্ঘ পোশাক পরিয়া অভিনেতারা অলংকার বহুল ভাষায় একটানা আবৃত্তি করিয়া যাইত।"[২]

নাটক উৎপত্তির পেছনে কিছু না কিছু ধর্মে প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রাচীন ইতিহাস সাহিত্য পর্যালোচনার মধ্যে ধর্মের দর্শনের মধ্যে ছাপ দেখা যায়। প্রাচীন গ্রিক নাটকের এই অবস্থার মূলেও ছিল ধর্মের প্রভাব। নাটকের বিষয়বস্তু ছিল গ্রিক পুরাণের আখ্যান,[৩]। দেব-দেবীদের মন্দিরে নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে ধর্মচর্চা হয়ে

মধ্যযুগের নাটকের ছাপ পরিলক্ষিত হয়, যা রেনেসাঁস যুগ হিসেবে বলা যেতে পারে। ধর্মের প্রভাব হতে বাস্তব জীবনকে নাটকে রূপদান করে। সে সময় নাটকজগতে শেক্সপিয়রের জন্ম হয়েছিল। শেক্সপিয়ারের নাটকে ইংল্যান্ডের সমাজ ব্যবস্থা জীবন চরিত্রর বৈশিষ্ট পটভূমির দেখা যায়। মানুষের চরিত্রের দিকটাই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি ছিল প্রধান লক্ষ্য। শেক্সপিয়ার নাটকে প্রেম প্রাচীন লোভ, দ্বেষ, হিংসা মোহ এসবই তীব্রভাবে দর্শন করেছে যা তার লেখকের মধ্যে হত্যা, বিবাদের দিক ধাবিত করেছে।" জার্মানির গ্যেটে ও শিলারও এই কাব্যপ্রধান নাটকের স্রষ্টা"[৪] / তার নাটকে ভাব, রূপ, চিত্র, জীবন, দর্শন ও আদর্শ অতি সুন্দরভাবে ফুটে ওঠেছে। ভারতীয় নাট্যের ধর্মের প্রভাব দেখা যায়। নাটকের বিষয়বস্তু রামায়ণ মহাভারত বা পুরাণ কাহিনীর রচনার জীবন প্রণালীতে বোঝা যায়। ভাসের নাটকে আমরা প্রাচীন কালের রাজা ও প্রজাদের রোমান্টিক চিত্র দেখতে পাই। "ভারতের নাট্যশাস্ত্রকে পঞ্চম-বেদ বলা হয়"[৫] / রবীন্দ্রনাথ নাটক রচনার ক্ষেত্রে যেমন বহুতত্ত্বের সমন্বয় ঘটিয়েছেন, তেমনি অভিনয়েও নতুনত্ব ও আধুনিকতার বিস্তার ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নাট্য সাহিত্যকে পাঁচ পর্বে বিভক্ত করেন। এগুলো হলো, গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, কৌতূকনাট্য, রূপক নাট্য বা সাঙ্কেতিক নাট্য ও নৃত্যনাট্য। এছাড়াও সামাজিক নাট্য, রোমান্টিক নাট্য, ঋতুনাট্যে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। নিম্নে তা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হলো–

১. **গীতিনাট্য :** রবীন্দ্রনাথ নাট্য সাহিত্যকে পাঁচ পর্বে বিভক্ত করেন। এগুলো গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, কৌতুক নাট্য, সাঙ্কেতিক নাটক ও নৃত্যনাট্য। রবীন্দ্রনাথ নাট্যসাহিত্যকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেন রূপকনাট্য বা সাঙ্কেতিক নাট্যের বিভাগটিকে। সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম-দর্শন এসব নানাবিধ চিন্তাজগতে পারিবারিকভাবে সঞ্চয়নই ঘটে রবীন্দ্রমননে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথ পারঙ্গমতার পরিচয় দেন। নাট্যজগতেও তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে কৃতিত্বের স্বাক্ষরের দাবিদার। অভিনয় শিল্প জগতে চর্চা ও অনুশীলন তাঁর সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতা সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করেছিল। জোড়াসাঁকোর পরিবারেরও অনেক সদস্য নাট্যজগতে অভিনয়ের সাথে জড়িত। পরিবারিক নাট্য ঐতিহ্যই রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহ প্রদান করেছিল। তৎকালীন অধিকাংশ নাটকে নায়ক নায়িকার উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি তেমন ভালো ছিল না। এসব দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ নিজে তদারকি করতেন। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, গীতিকবিতা প্রভৃতি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে কবি অনেক নাটক রচনা করেন। কবি নিজে সেগুলো নিরীক্ষা করেছেন। যেমন; গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, গীতিকাব্য, হেঁয়ালি নাট্য, একক নাট্য, নাটিকা, গদ্য-নাটক, প্রহসন এসব নাটকের নিরীক্ষার দায়িত্ব ছিল। এসব নাটকের মধ্যে জীবনমূখী জীবনাচার সামাজিক বৈষম্য তুলে ধরায় ব্রতী ছিলেন। মায়ার খেলা নাটকে নারী উন্নয়নের চিন্তা করে রচনা করেন। তৎকালীন পরিবারের নারীরা এ নাটকে অভিনয় করেন। এ নাটকে সামাজিক বিপ্লব হিসেবে চিহ্নিত। মহাকবি বাল্মীকি প্রথম জীবনে দস্যুসর্দার ছিলেন। প্রায় সময় তিনি কালীপূজায় দেবীকে নরবলি প্রদানে শিকারের উদ্দেশ্যে বের হতেন। তার সহচররা

নরবলীর জন্য এক বালিকাকে ধরে আনেন। বালিকার করুণ গান শুনে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বাল্মীকি। তাকে ছেড়ে দিতে আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু তার অনুচরেরা বাল্মীকির আদেশের গুরুত্ব অনুধাবন করতে না পেরে নিজেরাই পূজার আয়োজন করলেন এবং বলি দিতে উদ্যত হলেন। বাল্মীকি সহচরদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে পূজায় হস্তক্ষেপ করে বালিকাকে উদ্ধার করলেন। এরপর অনুচরেরা মৃগয়ার আয়োজন করলেন। কিন্তু অনুচরেরা এক হরিণের শাবক হত্যা করার উদ্দেশ্যে গেলে দয়াপরবশত হয়ে বাধা দিলেন। এতে অখুশি হয়ে বাল্মীকিকে এক ব্যাধ বধ করতে গেলে শোকার্ত দস্যুসর্দারের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়;

'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম : শাশ্বতী : সমা :,

যং ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবথী : কামমোহিতম'।[৬]

২. **কাব্যনাট্য :** কবিতা ও নাটকের সংমিশ্রণ হলো কাব্যনাট্য। কোনো নাটক সহজভাষায় কবিতা রূপে লেখা হলে সেটাই হলো কাব্যনাট্য। বিষয় ও আঙ্গিক সব শিল্পকর্মের প্রধান দুটি দিক। কাব্য নাটকে নির্দিষ্টতা নেই, যে কোনো বিষয় নিয়ে কাব্যনাটক রচিত হতে পারে। তবে কাব্যনাটকে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়, যা নাট্যক্রিয়া কাব্যবোধ কাব্যালংকার ছন্দ প্রভৃতি থাকতেই, শুধু কাব্যবোধ প্রকাশ পেলেই হবে না সেখানে নাট্যক্রিয়ার সংমিশ্রণ থাকতে হবে। কোনো ঘটনা বা কাহিনীকে সাজিয়ে রসের মাধ্যমে ব্যাপ্ত করাই কাব্যনাটক রচনার প্রাথমিক লক্ষ্য। উল্লেখ্য যে, যে রচনায় কাব্যগুণ নাট্যগুণকে অতিক্রম করেনা, এবং সমশক্তি সম্পন্ন হয়ে ওঠে এবং নাট্যধর্মের সাথে সহযোগিতা অথবা আনুগত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, তা হলো কাব্যনাট্য। আরো বলা হয়েছে নাটকে যদি হৃদয়ের রহস্য গভীর সত্যোপলব্ধির অভিব্যক্তি থাকে তখন তাকে কাব্যনাট্য বলে। চিত্রাঙ্গদা, বিদায়-অভিশাপ, গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস, কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ, লক্ষ্মীর পরীক্ষা।

৩. **রোমান্টিক ট্র্যাজেডি :** রোমান্টিক নাটক রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্য জগতে একটি পূর্ণাঙ্গ বস্তুধর্মী নাটক। এই নাটকে গল্পের ভাব বা তত্ত্বকে রূপায়িত করে। ইহা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার বাইরে বিশেষ শ্রেণির বিখ্যাত লোকদের কীর্তিকাহিনী রোমান্টিক নাটকে রূপদান করেছে। মূলত ইংরেজি নাট্যসাহিত্য হতে বাংলা নাট্যসাহিত্য প্রভাবাবিত হয়েছে।[৭] রোমান্টিক নাটকের বহিঃপ্রকাশ হলো রাজা রাণী, বিসর্জন ও মালিনী নাটক।

৪. **রূপক-সাংকেতিক নাটক :** সাহিত্যে বিচিত্র প্রতিভাভাস্বর রবীন্দ্রনাথ শুধু ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না, বিশ্বেও তাঁর সাহিত্যে প্রভাব লক্ষ করা যায়। কবি বিভিন্ন ধরনের নাটক রচনার পারদর্শী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ রূপক নাট্য বা সাঙ্কেতিক নাট্যের বিভাগটি। এটি বাংলা সাহিত্যে অনন্য সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাট্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো সঙ্গীতাত্মক বাণীভঙ্গির আশ্রয়ে কাব্য ও তত্ত্বে

মিলিত রূপ। রবীন্দ্রনাথের আগে রূপক নাটক নিয়ে বাংলা সাহিত্যে তেমন কেউ-এই শ্রেণির নাটকের কথা রচনা করে নাই। এ শ্রেণির নাটকের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব কথা বেশি প্রভাব দেখা যায়। পাশ্চাত্য সামজে এই ধরনের নাটকের প্রচলন দেখা যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যে মানুষের জীবন যাত্রার বাস্তবতার কাহিনীকে সংকেতরীতির মাধ্যমে নাটক প্রচলিত হয়। যদিও জার্মানির নাট্যকার হাউপ্টম্যান প্রথমে বাস্তব রীতিতে বিশ্বাসী পরবর্তী সময়ে রূপক-সাংকেতিক রীতি প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন।[৮] এতে দর্শকরা তাঁর বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কেন তিনি এই ধরনের নাটক রচনা করেন। পাশ্চাত্য নাট্য সমালোচকের মধ্যে রূপক সাংকেতিক নাটকের প্রভাব লক্ষ করা যায়। আধুনিক কোনো কোনো জায়গায় রূপক সাংকেতিকের সংকেত রূপ দিয়েছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য নাট্যকারের সাহিত্যজগতে রূপক নাটকের যে প্রভাব দিয়েছেন সেটি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ তাতে শিল্পরীতির ব্যবহার প্রয়োগ নাটকে দেখাতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথও তেমন নাটকগুলি জনসাধারণের মনে আকৃষ্ট করতে পারেনি। শুধু ইউরোপের লোকেরা এসব নাটকগুলো গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ অনেকটা এই রচনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। রূপক রচনার প্রধান কারণ নীতিকথা ভাব তত্ত্বকে সরস ও চিত্তাকর্ষক করে প্রকাশ করা। সংকেতের উদ্দেশ্য যে সত্য অতীন্দ্রিয়, জাগতীক, যে সৌন্দর্য চিরন্তন, তাহার ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনায় অনুভাবগম্য করা।[৯]

সংস্কৃতি সাহিত্য "প্রমোধচন্দ্রোদয়" নামে এইটা রূপক নাটক দেখা যায়। হেমচন্দ্র রচিত কাব্য "আশাকানন" এই কাব্যের ভূমিকায় লিখেছেন– মানবজাতীর প্রকৃতগত প্রভৃতিসকল প্রত্যক্ষীভূত করাই ইহার উদ্দেশ্য।[১০] অধ্যয় কুমার দত্তের "সুপ্রদর্শন" রূপক কাব্য। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ রূপক নাটকের নবরূপে সৃষ্টি করেছেন। ভারতীয় ধর্ম দর্শনের মূল-উৎস উপনিষদের রস-পুষ্ট রবীন্দ্রনাথের মানব জীবন (১৬৭২) তাঁহার কাব্য সাধনার মূলমত্র– 'সীমার মধ্যে অসীমের মিলনসাধন' (১৬৭) প্রকৃতির প্রতিশোধ, শারদোৎসব, রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর, ফাগ্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্র– (ক) রথের রাশি, (খ) কবির দীক্ষা, তাসের দেশ।

৫. **সামাজিক নাটক :** রবীন্দ্রনাথ সামাজিক নাটকে বিশেষ একটি স্থান দখল করে আছেন। সামাজিক নাটকে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতার নিরিখে সমাজের বাস্তব পরিবেশে মানুষের সমস্যাগুলো মোকাবিলায় যেসমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকে রূপদান করেছেন, তা নহে। সামাজিক জীবনে ব্যক্তিগত ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটকে রূপায়িত করেছেন। 'বাঁশরী' নাটকটির কাহিনী অনেকটা সামাজিক নাটকের আলোকে রচনা করা হয়। সামাজিক নাটকগুলো হলো প্রায়শ্চিত্ত, গৃহপ্রবেশ, শোধবোধ, নটীর পূজা, চন্ডালিকা, বাঁশরী, মুক্তির উপায় প্রভৃতি।

৬. **কৌতুকনাট্য :** রবীন্দ্রনাথের কৌতুক নাট্যগুলো মানুষের অন্তরে জাগরিত করেছেন। কৌতুকনাট্যের মাধ্যমে মানুষের মনকে নতুন আঙ্গিকে রূপদান করেছেন। তাঁর রচিত কৌতুক নাটকগুলো কাব্যধর্মী, গীতিধর্মী ও ভাবধর্মী। মানুষের গভীরে অনুভূতি ও আবেগের বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্র। কাব্য বা গীতিধর্মের মাধ্যমে হৃদয়ের গভীরের ভাব ও আবেগকে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে নতুনরূপে প্রকাশ করা। এটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অন্তরে বা হৃদয়ে রাজত্ব অপরটি মস্তিস্কে রাজত্বে। গীতিকবির রূপ গানের মাধ্যমে প্রকাশ অপরটি হাস্যরসের মাধ্যমে রোমান্টিকতা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশ করা। রবীন্দ্রনাথ বহু প্রতিভার অধিকারী, এটি তার নিজস্বতা ও পরিপূর্ণতা। কৌতূক নাট্যের তিনটি ধারা; একটি বিশুদ্ধ হাস্যরস যার ইংরেজি honour আর একটি সংস্কৃতি মার্জিত তীক্ষ্মবুদ্ধি বাকচাতুর্য যাকে ইংরেজিতে wit এবং অপরটি ব্যঙ্গ বা শেষ যার ইংরেজিতে saliro বা irony।[১১]।

বিশুদ্ধ হাস্যরসের বৈসাদৃশ্য দিক মনোভাব, জগৎ ও জীবনকে জাগরিত করার দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ মানবজীবনে স্বার্থপরতার অহংকার লোভ পঙ্কিলতাকে পরিহার করে বহিঃপ্রকাশে আনন্দ দেয়। হিউমার বিশুদ্ধ হাস্যরসে বৈশিষ্ট্য দেখেছেন বুদ্ধের কাছে, হৃদয়ের কাছে নয়। তাতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীলতা আবেগীয়ভাব নানা সাহিত্যে বিশেষ করে সংস্কৃত সাহিত্যেকে সমৃদ্ধ করেছে। তার সুনিপুন শব্দের প্রয়োগ আমাদের আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় হাস্যরস বিদ্রূপ পর্বে ব্যঙ্গ যাতে মানুষের অন্তরে আঘাত করা। এটির বৈশিষ্ট্যতা মানবজীবন সমাজ, ধর্ম, রাজনীতিতে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। এ প্রসঙ্গে[১২] কবি দ্বিজেন্দ্রলালের পরশুরাম অমৃতলালের প্রহসনগুলোতে হাস্যরসের নিদর্শন পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতে জাতীয় রাস্যররে উপস্থিত বেশি লক্ষ করা যায়। তার কৌতুকে কিছুটা স্পর্শ লক্ষ করা করেছে। তাঁর রচিত প্রহসন বা কমেডীয় মধ্যে হাস্যরসের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। তাঁর রচিত 'চিরকুমার সভা'য় কবি ব্যঙ্গের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের পূর্বেও বাংলা সাহিত্য প্রহসনের হাস্যরসের ধারা প্রচলিত ছিল। পথ প্রদর্শক মাইকেল ভূমিকা অগ্রগণ্য। মাইকেলের নাট্যগুলো বাঙ্গলির মনে প্রশান্তি দিয়েছে। তার রচিত নাট্যরসে কিছুটা wit ও honours থাকলে ব্যঙগরসের ধারাটি ছিল রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রহসন গোড়ায় গলদ। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ প্রহসনের প্রবর্ত্তক।[১৩]ইহা রবীন্দ্রনাথের মৈত্রের মানময়ী; গোড়ায় গলদ, বৈকুণ্ঠের খাতা, চিরকুমার-সভা, হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুক।

৭. **ঋতুনাট্য :** প্রকৃতিপ্রেমী রবীন্দ্রনাথের প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিশ্বে প্রকৃতিনুরাগবাদীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। কবি সাহিত্যের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ নয় প্রকৃতির প্রতিও তাঁর ছিল প্রেম। প্রকৃতি, স্রষ্টা ও জীবন এর সমন্বয়ে কবির মূল উৎস। এরই মধ্যে দিয়ে তিনি সারাজীবন মানবজীবনকে মুক্তির অন্বেষণে চেষ্টা করে গেছেন। সাহিত্যে

বিভিন্ন ক্ষেত্রে লেখনীতে প্রকৃতির প্রতি প্রেমের আভাসে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিশেষ করে খ্রিস্টপূর্ব ১৭৭০ হতে ১৮৫০ এর ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থ এর সাথে তাঁর তুলনা করা হয়ে থাকে। প্রকৃতির প্রেমের প্রতি তাঁর ভাবনা ও অনুভূতি ছিল আশ্চর্যরকম ব্যতিক্রম। কবি বলেন;

"আমি বেশ মনে করতে পারি তখন আমি এই পৃথিবীতে নতুন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লচিত্র হয়ে উঠেছিলাম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না। বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলদে এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একমাত্র আদৃত করে ফেলছে। তখন আমি এ পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গি দিয়ে প্রথম সূর্যালোকে করেছিলাম নবশিশুর মতো একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বর করে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলাম। এই আমার মাটির স্পর্শতাকে আমার শিখড়গুলো দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলাম।"

কবির অন্তরে প্রকৃতির অস্তিত্বের চিত্রে ফুটে ওঠেছে। শুধু কথায় নহে, জীবনে প্রতিটি সময়ে প্রকৃতির লগ্নের পরিচয় পাওয়া যায়। বাসস্থান, সৃষ্টিকর্ম, ধর্মকর্ম, জীবনধর্ম সব ক্ষেত্রে তার নিবিড় প্রকৃতির প্রেমের একান্ত ও নিবিড় প্রকৃতির প্রেমের একান্ত ও অভিন্ন এমনকি একপর্যায়ে তিনি অরণ্য প্রীতি প্রসঙ্গে নিজেকে উদ্ভিদভোজী বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতির আলো, বাতাস ও অপরূপ সৌন্দর্য এসব কিছু কবি সুনিপুণভাবে উপলব্ধি করেছেন। কবি সহজ সরল সৌন্দর্যের রূপমাধুরীকে নিমগ্ন থাকাকে বেশি ভালোবাসতেন। 'বর্ষা' কবির সবচেয়ে প্রিয় ঋতু। কবি 'শেষ সপ্তক' কাব্যেও শরতে বর্ণনায় তাঁর প্রকৃতির অপরিসীম উচ্ছ্বাস উদ্ভাসের ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। শরতের সনদ অস্থিমজ্জার গভীরতা অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। 'সেঁজুতি' কাব্যের 'নিঃশেষ' কবিতায় প্রকৃতির প্রতি তাঁর বৈরাগ্য ভাবের ব্যাকুলতার চিত্র ফুটে উঠেছে। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের 'আকাঙ্ক্ষা' কবিতায়ও কবির বিরহভাবনার ব্যকুলতার অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। শেষবর্ষণ, বসন্ত, নবীন, নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা, শ্রবণগাথা এসব ঋতুনাট্য ছিল কবির অন্যতম নাটক।

৮. **নৃত্যনাট্য :** নৃত্যনাট্যের রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল এক নতুন দিনের সূর্যের মতো। ১৯১৯ সালে ৫ই নভেম্বর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মনিপুরি মেয়েদের তৈরি টেবিল ক্লথ কবি মনে ভালো লাগায় তাঁত ও জীবনযাত্রার দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। নৃত্য প্রসঙ্গে কবি বলেন, শান্তিনিকেতন ছিল শিল্প চর্চায় এক চমৎকার পীঠস্থান। ১৯২৬ সালে "নটীর পূজা" নাটকে প্রথম অভিনয়ের সাথে নাচ, গান, প্রয়োগের ফলে তাঁর জীবন নৃত্যনাট্য রচনায় পূর্ণতা পায়। পরবতী সময় দীর্ঘ একটা সময় উপনিবেশিকতা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির কবলে পরে রবীন্দ্র নাটকের অনেকটা স্থবিরতা দেখা যায়। সময়ের প্রয়োজেনে বাংলাতেই এখন

রবীন্দ্র সাহিত্যে নাটক ও গান ব্যাপক প্রসারিত হয় শুধু তাই নয় জীববৈচিত্র্য, কবিতা, ছোট গল্প এবং অন্যান্য সাহিত্যকে অবলম্বন করে নাটক– চলচ্চিত্র রচিত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা, নৃত্যনাট্য শ্যামা, নটীর পূজা, নৃত্যনাট্য শাপমোচন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধ প্রভাবিত নাটকের ধারণা : বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির লালনক্ষেত্রের ভাণ্ডার ছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। পরিবারের সব সদস্যই বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পুরো পরিবারই সংস্কৃতি বিদ্যাভবন। সে সংস্কৃতি-অন্তপ্রাণ পরিবারেই রবীন্দ্রনাথের জন্ম। তাঁর জন্মের পূর্বেও পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি ছিল অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি। দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৯ সালে সিংহল ভ্রমণের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরবর্তী তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেন 'আর্যধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত' (১৮৯৯), অন্য পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ লিখেন 'বৌদ্ধধর্ম' (১৯০১)। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপুত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতা, নাটক, গানে, প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের গভীর নিদর্শন পাওয়া যায়। কবি বুদ্ধদেবকে 'অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি' করেছেন। কবির কাছে বুদ্ধ যেন মূর্তিমান প্রজ্ঞা ও করুণার আধার।' তিনি বৌদ্ধধর্ম-তত্ত্ব ও ধর্মদর্শন অপেক্ষা মানবতার কল্যাণের আদর্শের প্রতি, প্রেম, মৈত্রী, করুণা, অহিংসার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকে বৌদ্ধধর্ম দর্শন, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের যথেষ্ট ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাঁর রচনা নাটকের সংখ্যা ভারতবর্ষে পুরাণের ব্যবহার থাকলেও বেশি রয়েছে বৌদ্ধ সংস্কৃতির জীবন্তধারা; যা নবরূপায়ণের প্রচেষ্টা আরেকটি বিষয় লক্ষ করা যায় তাঁর রচিত নাটকগুলো বার বার পরিমার্জন করে বৌদ্ধ সংস্কৃতির রূপদান করার চেষ্টা করেন। এটি তার লেখনীর নিজস্ব শৈল্পিকতার মাধ্যমে বৌদ্ধ আখ্যানকে রূপায়িত করার চেষ্টা। তার প্রমাণ 'পরিশোধ' নাটক রচনায় প্রকাশ পায়। 'পরিশোধ' নাটকটি রচনার ৪০ বছর পরে নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' রূপান্তরের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এই নাটকে বৌদ্ধ আচরণের রূপরেখা প্রমাণ বহন করে। 'কথা' কাব্যের আখ্যান কবিতার কথা সবই বৌদ্ধ সংস্কৃতি থেকে নেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতি জগতের বেশি অনুপ্রেরণা পেয়েছেন 'সংস্কৃত অবদান সাহিত্য' (১৮৮২) সম্পাদিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র এর কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথকে সংস্কৃতির প্রতি বেশি আকৃষ্ট করেছে 'সংস্কৃত অবদান সাহিত্য' গ্রন্থটি প্রকাশের পর। ১৮৯৬ থেকে ১৯৩৯ সাল পযর্ন্ত বৌদ্ধ আখ্যানের প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ ও অনুরাগ। নিচের উক্তিটিতে তাঁর সত্যতা পাওয়া যায়;

এক সময়ে আমি যখন বৌদ্ধ কাহিনী এবং ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি জানলুম তখন তারা স্পষ্ট ছবি গ্রহণ করে আমার মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে এসেছিল। অকস্মাৎ 'কথা ও কাহিনী'র গল্পধারা

উৎসের মতো নানা শাখায় উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠল। সেই সময়কার শিক্ষায় এই-সকল ইতিবৃত্ত জানবার অবকাশ ছিল, সুতরাং বলতে পারা যায় 'কথা ও কাহিনী' সেই কালেরই বিশেষ রচনা। কিন্তু এই 'কথা ও কাহিনী'র রূপ ও রস একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মনে আনন্দের আন্দোলন তুলেছিল, ইতিহাস তার কারণ নয়। রবীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মাই তার কারণ- তাই তো বলেছে, আত্মাই কর্তা। তাকে নেপথ্যে ঐতিহাসিক উপকরণের আড়ম্বর করা কোনো কোনো মনের পক্ষে গর্বের বিষয়, এবং সেইখানে সৃষ্টিকর্তার আনন্দকে সে কিছু পরিমাণে আপনার দিকে অপহরণ করে আনে। কিন্তু এ সমস্ত গৌণ, সৃষ্টিকর্তা জানে। সন্ন্যাসী উপগুপ্ত বৌদ্ধ ইতিহাসের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এ কী মহিমাময়, এ কী করুণায়, প্রকাশ পেয়েছিল। এ যদি যথার্থ ঐতিহাসিক হত তা হলে সমস্ত দেশ জুড়ে 'কথা ও কাহিনী'র হরির লুট পড়ে যেত। আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি তার পূর্বে এবং তার পরে এ-সকল চিত্র ঠিক এমন করে দেখতে পায় নি। বস্তুত, তারা আনন্দ পেয়েছে এই কারণে, কবির এই সৃষ্টিকর্তৃত্বের বৈশিষ্ট্য থেকে। আমি একদা যখন বাংলাদেশের নদী বেয়ে তার প্রাণের লীলা অনুভব করেছিলুম তখন আমার অন্তঅরাত্ম আপন আনন্দে সেই সকল সুখদুঃখের বিচিত্র আভাস অন্তঃকরণের মধ্যে সংগ্রহ করে মাসের পর মাস বাংলার যে পল্লীচিত্র রচনা করেছিল তার পূর্বে আর কেউ তা করেনি। কারণ, সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় একলা কাজ করেন। সে বিশ্বকর্মার মতন আপনাকে দিয়ে রচনা করে[১৪]।

রবীন্দ্রনাথ প্রায় সময় সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখিতে ব্যস্ত থাকতেন। ভারতের পৌরাণিক কাহিনী বা তথ্য সংগ্রহ করে কখনো কাহিনী আবার কখনো চরিত্রকে অবলম্বন করে নাটক সৃষ্টি করতেন। তাঁর নাটকগুলোতে বৌদ্ধধর্মের সংস্কৃতি ও ভাবধারা লক্ষ করা যায়। কবি কবিতা থেকে নাটক আবার নাটক থেকে নৃত্যনাট্য বানানোর শৈল্পিকতায়ও পারদর্শী ছিলেন। তিনি পঞ্চাশের অধিক নাটক রচনা করেছেন। তিনি নাটকগুলো বার বার পরিমার্জন করতেন। বিশেষ করে বৌদ্ধ সংস্কৃতি নাটকগুলোতে বেশি লক্ষ করা যায়। তাঁর প্রমাণ মিলে 'রাজা' নাটকে চারবার পরিমার্জন ও সংশোধন করার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের যেসব নাটকগুলিতে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ করা যায়, তার মধ্যে অন্যতম নাটকগুলো হলো 'মালিনী' (১৮৯৬) 'নটীর পূজা' (১৯২৬), 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৩)। এই নাটকগুলির কাহিনী বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে ঘিরে রচিত। নাটকগুলোর কাহিনী, ধরন, চরিত্র, বৌদ্ধ সংস্কৃতিকেন্দ্রিক। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত নাটকের কাহিনী তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'সংস্কৃতি অবদান সাহিত্য' থেকে। এছাড়াও আরো সহায়ক হিসেবে ধর্মরাজ বড়ুয়ার 'হস্তসার' (১৮৯৩) গ্রন্থ থেকে উপাত্ত বা কাহিনী আনা হয়েছে। তিনি নাটকে সামাজিক, ধর্মীয়,

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বৈষম্য ও কুসংস্কারের বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এছাড়াও প্রতিবাদী মূলক অনেক নাটক, গান, কবিতাও রচনা করেছেন। ভারতবর্ষের কৃষ্টি, সভ্যতা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক লেখনীর মাধ্যমে তুলে এনেছেন। নিম্নে রবীন্দ্রনাথের রচয়িত যে সমস্ত নাটকে বৌদ্ধপ্রভাব লক্ষ করা যায়, তা ব্যাখ্যা করা হলো।

মালিনী : মালিনী নাটকটি বুদ্ধের জীবন কাহিনীনির্ভর নাটক। এটি রবীন্দ্রনাথের নাট্যজগতে প্রথম রচিত নাটক। সম্পূর্ণ স্বপ্নে পাওয়াকে কাহিনীকে কেন্দ্র করে এটি রচিত। এটি অনেকটা বৌদ্ধআখ্যান নিয়ে রচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি;

> *'মালিনী নাটিকার উৎপত্তির একটা বিশেষ ইতিহাস আছে, সে স্বপ্নঘটিত। কবিকঙ্কণকে দেবী স্বপ্নে আদেশ করেছিলেন তাঁর গুণকীর্তন করতে। আমার স্বপ্নে দেবীর আবির্ভাব ছিল না, ছিল হঠাৎ মনের একটা গভীর আত্মপ্রকাশ ঘুমন্ত বুদ্ধির সুযোগ নিয়ে। তখন ছিলুম লণ্ডনে। নিমন্ত্রণ ছিল প্রিমরোজ হিলে তারক পালিতের বাসায়। প্রবাসী বাঙালিদের প্রায়ই সেখানে হতো জটলা, আর তার সঙ্গে চলত ভোজ। গোলেমালে রাত হয়ে গেল। যাঁদের বাড়িতে ছিলুম, অত রাত্রে দরজার ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে হঠাৎ চমক লাগিয়ে দিলে গৃহস্থ সেটাকে দুঃসহ বলেই গণ্য করতেন; তাই পালিত সাহেবের অনুরোধে তাঁর ওখানেই রাত্রিযাপন স্বীকার করে নিলুম। বিছানায় যখন শুলুম তখনো চলছে কলরবের অন্তিম পর্ব, আমার ঘুম ছিল আবিল হয়ে। এমন সময় স্বপ্ন দেখলুম, যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হল দুই হাতের শিকল তাঁর মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিসাৎ করে। জেগে উঠে যেটা আমাকে আশ্চর্য ঠেকল সেটা হচ্ছে এই যে, আমার মনের একভাগ নিশ্চেষ্ট শ্রোতামাত্র, অন্যভাগ বুনে চলেছে একখানা নাটক। স্পষ্ট হোক অস্পষ্ট হোক একটা কথাবার্তার ধারা গল্পকে বহন করে চলেছিল। জেগে উঠে সে আমি মনে আনতে পারলুম না। পালিত সাহেবকে মনের ক্রিয়ার এই বিস্ময়করতা জানিয়েছিলুম। তিনি এটাতে বিশেষ কোনো ঔৎসুক্য বোধ করলেন না। কিন্তু অনেক কাল এই স্বপ্ন আমার জাগ্রত মনের মধ্যে সঞ্চরণ করেছে। অবশেষে অনেক দিন পরে এই স্বপ্নের স্মৃতি নাটিকার আকার নিয়ে শান্ত হল।'*[১৫]

রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নে ঘটিত কাহিনীর সাথে যুক্ত হয়েছে মহাবস্তু অবদান গ্রন্থ আখ্যানসমূহ। বারানসীর রাজা কৃকির কন্যা মালিনী ভিক্ষু কাশ্যপকে খুব শ্রদ্ধা করে। একদিন মালিনী ভিক্ষু কাশ্যপ ও তাঁর অনুসারীদেরকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন। এতে মালিনীর উপর ব্রাহ্মণসমাজে

প্রতিবাদের ঝড় ওঠে এবং তার উপর ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে নির্বাসনদন্ড দেয়। মালিনী নির্বাসনে যাওয়ার পূর্বে এক সপ্তাহ সময় প্রার্থনা করে। মালিনীর অনুরোধের কথা সবাই মেনে নিয়েছেন। মালিনীর পরিবারসহ সবাই তাকে স্নেহ ও ভালোবাসত। মালিনীর আচরণে মুগ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণসমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং তারা সবাই বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। রাজা সেটি মেনে নিতে পারেন নাই। রাজা মেয়ে মালিনীকে বলেন–

'হায় রে অবোধ মেয়ে, নব ধর্ম যদি
রেতে আনিতে চাস, সে কি বর্ষানদী
একেবারে তট ভেঙে হইবে প্রকাশ
দেশবিদেশের দৃষ্টিপথে? লজ্জাত্রাস
নাহি তার? আপনার ধর্ম আপনারি,
থাকে যেন সংগোপনে, সর্বনরনারী
দেখে যেন নাহি করে দ্বেষ, পরিহাস
না করে কঠোর। ধর্মেরে রাখিতে চাস
রাখ মনে মনে।'[১৬]

কিন্তু রাজার মেয়ে মালিনীকে এই কথা বলার পরেও কোনো সুফল আসেনি। এতে মালিনী ও তার সহচারীরা ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। ব্রাহ্মণেরা মালিনীর বিরুদ্ধে বিচার ও শাস্তি চায়। ব্রাহ্মণেরা ভিক্ষু কাশ্যপকে গোপনে হত্যার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। কিন্তু তাতেও সফল হয়নি। ভিক্ষু কাশ্যপের শীল ও বুদ্ধিমত্তার কাছে সকলেই পরাজিত হন। ভিক্ষু কাশ্যপ তাদের হত্যার ষড়যন্ত্র থেকে বেঁচে গেলেন। এই কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথের জীবন প্রবাহে ব্যথিত ও আন্দোলিত করে। এই কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন মালিনী নাটকটি। এটি তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। এই কাহিনী রবীন্দ্র চেতনাকে আলোড়িত করেছে। কাহিনীটি বৌদ্ধ আখ্যানকে অক্ষুণ্ন রেখে নিজস্ব শৈল্পিকতার মাধ্যমে নাটকের সুপ্রিয় ও ক্ষেমংকর নামাংকিত করে আলাদা দুটি কাহিনী সৃষ্টি করে নাট্যরূপ দিয়েছেন। হিন্দুধর্মের অনুসারীরা মালিনীকে শাস্তি দেয়। এতে মালিনী তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়। রাজার আদেশ অমান্য না করে নির্বাসন মেনে নিয়ে মালিনী বলে–

শোনো পিতা-যারা চাহে নির্বাসন মোর
তারা চাহে মোরে। ওগো মা, শোন্ মা কথা
বোঝাতে পারি নে মোর চিত্তব্যাকুলতা।
আমারে ছাড়িয়া দে মা, বিনা দুঃখশোকে,

শাখা হতে চ্যুত পত্রসম। সর্বলোকে
যাব আমি-রাজদ্বারে মোরে যাচিয়াছে
বাহির-সংসার। জানি না কী কাজ আছে,
আসিয়াছে মহাক্ষণ।[১৭]

রাজার আদেশ অমান্য না করে নিবার্সনে গিয়ে রাজপ্রসাদের বাইরে এসে মালিনী এসে আত্মঘোষণা করে এভাবে;

আসিয়াছি আজ
প্রথমে শিখাও মোরে কী করিব কাজ
তোমাদের। জন্ম লভিয়াছি রাজকুলে,
রাজকন্যা আমি-কখনো গবাক্ষ খুলে
চাহি নি বাহিরে, দেখি নাই এ সংসার
বৃহৎ বিপুল-কোথায় কী ব্যথা তার
জানি না তো কিছু। শুনিয়াছি দুঃখময়
বসুন্ধরা, সে দুঃখের লব পরিচয়
তোমাদের সাথে।[১৮]

বুদ্ধ রাজ্যসুখ ভোগ না করে সংসারের মায়ামমতা ত্যাগ করে মুক্তি লাভের আসায় রাজপ্রাসাদ থেকে বের হন। মালিনী তেমনি বুদ্ধ আদর্শকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করার ব্রতী হলেন। মালিনীর আচরণে বুদ্ধের জীবনাদর্শে ক্ষমার ছাপ লক্ষ করা যায়। তাতেও মালিনীর কোন অনুশোচনা নাই। এটি নারী জাতির একটি মহৎ গুণ বা ত্যাগের মহিমা। এই নাটকে মালিনীর আচরণ ক্ষমার একটি বহিঃপ্রকাশ। মালিনীর শেষ উক্তি– 'ক্ষম ক্ষেমাংকর' বলে ক্ষমার চরম মহৎ গুণ প্রকাশিত হয়। মানুষের ধর্ম গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেন; 'শত্রু হননের সহজ প্রবৃত্তি মানুষের জীবন ধর্ম, তা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে মানুষ অদ্ভুত কথা বললো, 'শত্রুকে ক্ষমা করো'। এই কথাটি জীব ধর্মের হানিকর কিন্তু মানবধর্মের উৎকর্ষ লক্ষণ'। বৌদ্ধদর্শনের এই ভাবধারা রবীন্দ্রকাব্যে উত্তরাধিকার রক্ষা করিয়াছে। কবি লিখিয়াছেন।

দন্ডতির সাথে
দন্ডদাতা কাঁদে যাবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ
কোনো ব্যাথা নাহি পায় তার দন্ডদান

প্রবলের অত্যাচার।

মাতা যতা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরকেখে

এবম্পি সব্ব ভূতেসুমানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।[১৯]

মাতা যেমন তাঁর একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করেন, সর্বজীবের প্রতি সেইরূপ আচরণ করা বা রক্ষা করা উচিত।

অচলায়তন ও গুরু : রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কর্মের মধ্যে নাটক 'অচলায়তন' দিব্যাবদানমালার গ্রন্থ হতে পঞ্চকের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। নাটকটি আরো সহজলভ্য করার জন্য গুরু (১৯১৮) নামে কিছুটা রূপান্তর করা হয়েছে। নাটকের কাহিনী সংক্ষেপে দেওয়া হলো– এক ব্রাহ্মণ সংসার জীবনে অনেক দুঃখ কষ্টে জীবন যাপন করেন। তার সংসারে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করে। এতে তিনি অনেক চিন্তিত। পরবর্তী সময়ে চিন্তা করলেন, ভিক্ষুসংঘের আশীর্বাদ প্রয়োজন। অবশেষে তার এক সন্তান অনেক কষ্টে ভিক্ষু-সংঘের আশীর্বাদে মৃত্যুর দুয়ার থেকে রক্ষা পেল। সেই শিশুটি নাম রাখলেন মহাপঞ্চক। পরবর্তী সময়ে তার আরো একটি শিশু বেঁচে গেলেন। তারই নাম রাখলেন পঞ্চক। তাদের দুই সন্তানের আচার আচরণ বিপরীতমুখী। মহাপঞ্চক জ্ঞানী এবং সন্ন্যাস জীবন প্রতিপালনে অর্হৎ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলেন। পঞ্চক সন্যাস জীবন অবলম্বন করলেও কিন্তু মূর্খ। বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তেমন মনোযোগ ছিল না। তার ভাই মহাপঞ্চক তাকে বের করে দিলেন। রাস্তার পাশে ক্রন্দনরত অবস্থায় গেলে বুদ্ধ তাকে বিহারে নিয়ে আসেন এবং একজন জ্ঞানী ভিক্ষুর উপর শিক্ষার ভার দিলেন। এতে পঞ্চক অতি সন্নিকটে অর্হৎ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন। এ নাটকে বিহারকেই অচলায়তন বলা হয়েছে। দীর্ঘদিনের সংস্কার ও প্রবৃত্তিতে অচলায়তনের গন্ডিবদ্ধ শিক্ষা হয়ে পড়ে। পঞ্চকের এসব কিছু আর ভালো লাগে না এবং সুযোগ পেলেই বাইরে আলো-বাতাস উপভোগ করে। তাই উল্লিখিত হয়েছে;

আকাশে কার ব্যাকুলতা,

বাতাস কহে কার বারতা

এ পথে সেই গোপন কথা

কেউ তো আনে না।

পঞ্চক সুযোগ বুঝে পাংশুদের সাথে মেলামেশা করে, এবং তার মনে হয়– 'এ আলোতে ভরা নীল আকাশটা আমার রক্তের ভিতরে গিয়ে কথা কচ্ছে আমার সমস্ত শরীরটা গুন গুন করে বেড়াচ্ছে।[২০] তাছাড়া দাদাঠাকুরের সান্নিধ্যে মুক্তির স্বাদ পাওয়ার তুল্য। সে দাদা ঠাকুরকে বলে, 'যতবার বাইরে এসে তোমার সঙ্গে দেখা হয় ততবার ফিরে গিয়ে অচলায়তনে আমাকে যেন আর ধরে না। হয় ওটাকে বড়ো করে দাও, নয় আমাকে আর

বাড়তে দিয়ো না।[২১] দাদাঠাকুর যেন পঞ্চকের যাত্রার পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে। দাদাঠাকুর ও পঞ্চকের সংলাপ :

> দাদাঠাকুর– না না, পঞ্চক না। যাও ভাই, তুমি তোমার অচলায়তনে ফিরে যাও। যখন সময় হবে দেখা হবে।
>
> পঞ্চক– কী জানি ঠাকুর, যদিও আমি কোনো কর্মেরই না, তবু ইচ্ছে করছে তোমাদের সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে পড়ি।
>
> দাদাঠাকুর– না পঞ্চক, তোমার গুরু আসবেন, তুমি অপেক্ষা করো গে।
>
> পঞ্চক– তবে ফিরে যাই। কিন্তু ঠাকুর, যতবার বাইরে এসে তোমার সঙ্গে দেখা হয় ততবার ফিরে গিয়ে অচলায়তনে আমাকে যেন আর ধরে না। হয় ওটাকে বড়ো করে দাও, নয় আমাকে আর বাড়তে দিয়ো না।
>
> দাদাঠাকুর আয়রে, তবে যাত্রা করি।

এ কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথের মনে গভীরভাবে রেখাপাত হয়েছে। সে কাহিনী ভিত্তি করে অচলায়তন নাটকটি রচনা করেছেন। সে নাটকটি তার একান্ত নিজস্বে চিন্তা ভাবনায় ভাস্বর। মানুষের দৃঢ়তা ও ইচ্ছাশক্তি থাকলে যেকোনো সময় লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছনো সম্ভব। রবীনাদ্রনাথ অচলায়তন নাটকটিতে অর্ন্তনিহিত ভাবকে অধিকার দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন কোনো তন্ত্রমন্ত্র সমন্বয় মানুষের চিন্তা উদ্ভাসিত হয় না। ইচ্ছা শক্তি মানুষকে পরিবর্তন করে। মহাযানের মতাদর্শে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে প্রভাব দেখা যায়। অচলায়তন কাহিনী রবীন্দ্রনাথের জীবনকে প্রভাবিত করেছে। অচলায়তন কাহিনীটি নতুন ভাব ধারায় সৃষ্টি। বৌদ্ধধর্মে আদর্শগত দিক হলো এটি জ্ঞানীর ধর্ম। চিত্ত জগতকে জাগরিত ধর্ম ও মানুষের বিমুক্ত সাধনার ধর্ম। পরবর্তীসময়ে এ ধর্ম আস্তে আস্তে তন্ত্রমন্ত্র সমন্বিত হয়ে অনেক বিকৃত হয়ে মহাযানের স্রোতধারা প্রবাহিত হয়েছিল। 'বৌদ্ধধর্ম জীর্ণ হয়ে, বিদীর্ণ হয়ে, টুকরো টুকরো হয়ে নানাপ্রকার বিকৃতিতে পরিণত হয়েছিল'।[২২] "চারপাশে পাথরের চারটি প্রচীর, বদ্ধ দরজা, নানা রেখার গণ্ডি, স্তুপাকার পুঁথি আর অহোরাত্র মন্ত্র পাঠের গুঞ্জনধ্বনি"।[২৩] রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রবন্ধেও এই কথা প্রকাশ করেছেন, যা তিনি গভীর ভাবে অনুধাবন করেছেন। তিনি বলেছেন;

> *'তখন শ্রান্ত পুরাতন ভারতবর্ষে বৈদিক ধর্ম বৌদ্ধদের দ্বারা পরাস্ত; এবং বৌদ্ধধর্ম বিচিত্র বিকৃত রূপান্তরে ক্রমশ পুরাণ-উপপুরাণের শতধা-বিভক্ত ক্ষুদ্র সংকীর্ণ বক্র প্রণালীর মধ্যে স্রোতোহীন মন্দগতিতে প্রবাহিত হইয়া একটি সহস্রলাঙ্গল শীতরক্ত সরীসৃপের ন্যায় ভারতবর্ষকে শতপাকে জড়িত করিতেছিল। তখন ধর্মে সমাজে শাস্ত্রে কোনো বিষয়ে নবীনতা ছিল না, গতি ছিল না, বৃদ্ধি ছিল না, সকল বিষয়েই যেন পরীক্ষা শেষ হইয়া গেছে, নূতন আশা করিবার বিষয় নাই'।*[২৪]

রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের তান্ত্রিকতার প্রভাব পেয়েছেন বিশেষ করে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত Sanskrit Buddhist Literature of Nepal গ্রন্থ। সেই গ্রন্থে সেখানে মহাযান বৌদ্ধধর্ম মন্ত্রতন্ত্র বিকৃত পটভূমি অচলায়তন নাটকে পেয়েছেন। বৌদ্ধধর্ম সঠিক আদর্শ থেকে মহাযানের তান্ত্রিকতার স্পষ্ট উপলব্ধি করেছেন। হিন্দুধর্মে যখন কুসংস্কারের কার্যকলাপে পরিপূর্ণ, বৌদ্ধধর্ম বজ্রাসন, তন্ত্রাসনে, মন্ত্রাসনের মাধ্যমে নিয়োজিত প্রকৃত ধর্ম থেকে সরে যাচ্ছেন। বিভিন্ন তান্ত্রিকতার ছোঁয়া রুদ্ধ হচ্ছে মানুষে মানুষে-অন্ধবিশ্বাসে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে তখন রবীন্দ্রনাথ ১৩১৮ সালে শিলাদাহ যান। বৌদ্ধ দিব্যবদান[২৫] মালার পঞ্চক কাহিনী থেকে তথ্য সংগ্রহ অচলায়ন নাটকটি লিখেছেন পরবর্তী সময়ে নাটকটি সহজভাবে ও উপযোগী করে আরেকটি নামকরণ করেছেন "গুরু"। অচলায়তন নাটকে পঞ্চকের কাহিনীতে পাওয়া যায় পুরাকালে অদীনপূণ্যকে আচার্য করে আর্যগুরু যে বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কালেকালে প্রাণহীন অন্ধ কুয়াশাচ্ছন্ন কুসংস্কারের পুনরাবৃত্তিতে তা অচলায়তনরূপে পরিণতি লাভ করে। সেই অচলায়তন বাইরের সমস্ত যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন।'ডাকঘর' নাটকের অমল, 'মুক্তধারা' নাটকের অভিজিৎ এবং 'রক্তকরবী' নাটকের রঞ্জনের মতো 'অচলায়তন' নাটেকর পঞ্চক হলো মানবাত্মার মুক্তির প্রতীক। অচলায়তন নাটকে প্রথাবিরোধিতার পথ দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। 'জীর্ণপুরাতন যাক ভেসে যাক' এই বাণীই প্রকাশ করেছেন এই নাটকে। মহাপঞ্চক, শোণপাংশু, ওদর্ভকগণ যথাক্রমে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিমার্গের পথিক। এ তিনের সমন্বয়ের সাধনার সার্থকতা-নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই ইঙ্গিত দিয়েছেন। এটি প্রকাশিত হলে ব্যাপক সমালোচনা হয়। প্রশংসার পাশাপাশি বিরূপ সমালোচনারও শিকার হন নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ। মন্ত্র ও আচারকে বিদ্রূপ করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এই অভিযোগের জবাবে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন;

> *'নিজের দেশের আদর্শকে যে ব্যক্তি যে-পরিমাণে ভালোবাসিবে সেই তাহার বিকারকে সেই পরিমাণেই আঘাত করিবে, ইহাই শ্রেয়স্কর। ভালোমন্দ সমস্তকেই সমান নির্বিচারে সর্বাঙ্গে মাখিয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকাতেই প্রেমের পরিচয় বলিতে পারি না। দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে যাহা আমাদের বুদ্ধিকে শক্তিকে ধর্মকে চারিদিকে আবদ্ধ করিয়াছে। আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের সমস্ত-দেশব্যাপী এই বন্দীশালাকে একদিন আমিও নানা মিষ্ট নাম দিয়া ভালোবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায় নাই। অচলায়তনে আমার সেই বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু বেদনা নয়, আশাও আছে'।*

'রবীন্দ্রনাথ অচলায়তন' নাটকে পুরানো জীর্ণকে ভেঙ্গে নতুন করে উদ্ভাসিত করার কথা বলেছেন।

রাজা (১৯১০) ও অরূপরতন (১৯২০) : রাজা নাটকাটি কুশ জাতকের মহাবস্তু অবদান গ্রন্থ হতে নেয়া হয়েছে।[২৬] এই জাতকের কাহিনী পালি কুশ জাতকের সাথে মিল থাকলেও স্থান ও নামের পার্থক্য ভিন্নতা আছে। এই নাটকের অভিনয় সংস্করণ করে অরূপ রতন। (১৯০২) নাট্যরূপকে বর্ণিত করা হয়েছে। এই নাটকটিকে সমন্বয় করে পরবর্তী সময় রবীন্দ্রনাথ শাপমোচন কবিতা (১৯৩০) ও শাপমোচন কথিকা (১৯৩১) রচনা করেছেন। কুশ জাতকের কাহিনীকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনীকে ভিত্তি করে তাঁর লেখনীর শৈল্পিক কাব্যময়তা দিয়ে রূপকনাট্য সৃষ্টি করেছেন। এই কাহিনীতে রূপে, রসে ও ভাব প্রকাশে ফুটে ওঠেছে। 'রাজা' (১৯১০) নাটকের উপাদান মহাবস্তাবদানে কুশ জাতকের কাহিনী থেকে হুবহু অনুসরণ করেছেন। রাজা নাটক থেকে কবি 'অরূপরতন' ও 'শাপমোচন' কবিতা রচনা করেন। গল্পটি কুশ ও প্রভাবতীকে নিয়ে নির্মিত হয়েছে। জাতকের কাহিনীটি হলো– মল রাজ্যের জ্যেষ্ঠ রাজকুমার কুশ অত্যন্ত জ্ঞানী কিন্তু কুশ্রী। তার বিবাহ হয় সুন্দরী শ্রেষ্ঠী মদ্ররাজ কন্যা প্রভাবতীর সঙ্গে কুশের মা পুত্র ও পুত্রবধূকে দিনের বেলায় কারো সাথে দেখা করতে দিতেন না। একসময় প্রভাবতী কুশ্রী স্বামীকে দেখে তাকে ছেড়ে পিত্রালয়ে চলে যাওয়ার মন স্থির করলেন। কবি নাটকের কাহিনীতে অন্ধকার ঘরে রাজার সাথে সুদর্শনার দেখা হয়। পত্নী সুদর্শনা তাকে অন্ধকারের বাইরে দেখা করতে চান। রাজা তাকে বলেছেন বসন্ত পূর্ণিমার রাতে তুমি তোমার প্রাসাদের শিখরের উপর দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখো আমার বাগানে সহস্র লোকের মধ্যে আমাকে দেখা যাবে। দেখার পরে সুদর্শনা পিতৃগৃহে চলে আসেন। সেখানে তার স্বয়ংবর সভা। সভায় তিনি বলেন, দেহে আমার কলুষ লেগেছে, এ দেহ আজ আমি সবার সমক্ষে ধুলোয় লুটিয়ে যাব। সত্যনিষ্ঠা রাজা নাটকে মানবহৃদয়ের রূপে, রসে ও ভাবোদর্শ উপলব্ধির ইতিহাস প্রকাশ পেয়েছে।[২৭] রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই নাট্য-রূপকটি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে;

> *"সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভান্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধনজন খ্যাতি, সেই খানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল তখন কেমন করিয়া তাহার চারি দিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল– সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে-প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, সকল রূপে, আপন অন্তরের আনন্দরসে র্যাহাকে উপলব্ধি করা যায়-এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে"।*[২৮]

সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি। এই চরিত্র দুটি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাবধারায় রূপায়িত হয়েছে। সুরঙ্গমা ভক্ত সাধিকার প্রতিক ঐকান্তিক নিষ্ঠাতেই যার সমস্ত চরিত্র স্থিতি পেয়েছে।[২৯] অরূপরতন নাটকে সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদাদা চরিত্র দুটি নতুন সৃষ্টি। এছাড়া 'রাজা' নাটকটিরই পুনর্লিখিত রূপ এই 'অরূপরতন'। ঠাকুরদাদার কণ্ঠে আছে গান :

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই
রাজার রাজত্বে।
নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কী স্বত্বে
আমরা যা খুশি তাই করি
তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার
ত্রাসের দাসত্বে।
নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কী স্বত্বে॥[৩০]

এই নাটকটিতে ঠাকুরদাদা ছাড়াও বালকগণ, বাউল ও সুরঙ্গমাও গান গায়।

নটীর পূজা (১৯২৬) : রবীন্দ্রনাথের 'পূজারিণী' কবিতার বিষয়বস্তু থেকে রূপান্তর করা হয়েছে 'নটীর পূজা' নাটক। নাটকের আখ্যানগুলো অবদানশতক থেকে হয়েছে। মগধের অধিপতি রাজা বিম্বিসারের একটি জ্যোতিস্ক নামে নান্দনিক প্রাসাদ ছিল। এই প্রাসাদটি তার এক পুত্রকে দান করেন। এতে পুত্র অজাতশত্রু পিতার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন। পুত্র অজাতশত্রু বুদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। রাজা বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে একটি স্তুপ নির্মাণ করে পূজা করতেন। পরবর্তী সময়ে অজাতশত্রু দেবদত্তের প্ররোচনায় প্রজাদের আদেশ জারি করেন; যারা বুদ্ধের স্তুপকে পূজা করবে তাদের শিরশ্ছেদ করা হবে। একদিন দাসী রাজার আদেশ অমান্য করে স্তুপ ধুয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে পূজা করে। রাজা তা জানতে পেরে আদেশ করে তার মাথা শিরশ্ছেদ করার। একদিন রাজা শিকারের জন্য বনে গেলে এক শ্রমণের সঙ্গে দেখা হয়। রাজা অজাতশত্রু শ্রমণের উপদেশ শুনে তাঁর কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করে এবং বুদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। বুদ্ধকে পূজা নিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করার কাহিনী নিয়েই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন 'নটীর পূজা'। মূল কাহিনীর চরিত্র শ্রীমতীই রবীন্দ্রনাথের নটী। বিম্বিসার স্বেচ্ছায় সিংহাসনের রাজ্যভার ছেলেকে অর্পণ করেন। অজাতশত্রু এই

নাটকেই রাজা। এই নাটকের শুরুতে উপালী ভিক্ষু শ্রীমতীকে 'তুমি ভাগ্যবতী' এই বলে আশীর্বাদ করলেন। এতে তার মনে আত্মত্যাগের মহিমা ফুটে ওটে। তার মনে গান :

নিশীথে কী কয়ে গেল মনে,
কী জানি, কী জানি।
সেকি ঘুমে সে কি জাগরণে
কী জানি, কী জানি।
নানাকাজে নানামতে
ফিরি ঘরে, ফিরি পথে
সে-কথা কি অগোচরে বাজে ক্ষণে ক্ষণে
কী জানি, কী জানি।
সে-কথা কি অকারণে ব্যথিছে হৃদয়,
একি ভয়, একি জয়।
সে-কথা কি কানে কানে বারে বারে কয়
"আর নয়, আর নয়।"
সে-কথা কি নানাসুরে
বলে মোরে, "চলো দূরে,"
সে কি বাজে বুকে মম, বাজে কি গগনে,
কী জানি, কী জানি।[৩১]

এভাবে শ্রীমতি গানে গানে আত্মনিবেদনের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তোলে। একসময় বুদ্ধের পূজার আসনের সামনে শ্রীমতীর নাচের আদেশ আসে। এতে সবাই মনে করে শ্রীমতী এই পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হতে পারবে না। কিন্তু শ্রীমতী জানে বুদ্ধই একমাত্র মুক্তিদাতা বা ত্রাণকর্তা। তাই সে আসরে নামে এবং নাচে। গায় :

আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমঃ
তোমায় স্মরি, হে নিরুপম,
নৃত্যরসে চিত্ত মম
উছল হয়ে বাজে।
আমার সকল দেহের আকুল রবে
মন্ত্র হারা তোমার স্তবে

ডাহিনে বামে ছন্দ নামে

নব জনমের মাঝে।

তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ

সংগীতে বিরাজে।[৩২]

রত্নাবলী নাচের ধরণ ও অর্থ কিছুই বুঝতে পারেন নাই। তথাপি লোকেশ্বরী বাধা না দিয়ে রত্নাবলীকে নাচতে সাহস জোগায়। এতে শ্রীমতী নৃত্য ও গীত গান গায়;

এ কী পরম ব্যথায় পরান কাঁপায়

কাঁপন বক্ষে লাগে

শান্তি সাগরে ঢেউ খেলে যায়

সুন্দর তায় জাগে।

আমার সব চেতনা সব বেদনা

রচিল এ যে কী আরাধনা,

তোমার পায়ে মোর সাধনা

মরে না যেন লাজে।

তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ

সংগীতে বিরাজে।[৩৩]

রত্নাবলী বলে, 'এ কী হচ্ছে? গয়নাগুলো একে একে তালে তালে ওই স্তূপের আবর্জনার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে! ওই গেল কঙ্কণ, ওই গেল কেয়ূর, ওই গেল হার! মহারানী, দেখছেন এ সমস্ত রাজবাড়ির অলংকার-এ কী অপমান! শ্রীমতী, এ আমার নিজের গায়ের অলংকার। কুড়িয়ে নিয়ে এসে মাথায় ঠেকাও, যাও এখনই।'

লোকেশ্বরী তাকে শান্ত হওয়া জন্য বলে এবং আনন্দে তার শরীরে নিজের গলার হার খুলে ফেলে। শ্রীমতী গান ও নৃত্য করতে থাকে :

আমি কানন হতে তুলিনি ফুল,

মেলেনি মোরে ফল।

কলস মম শূন্যসম

ভরিনি তীর্থজল।

আমার তনু তনুতে বাঁধনহারা

হৃদয় ঢালে অধরা-ধরা,

তোমার চরণে হ'ক তা সারা,

পূজার পুণ্য কাজে।

তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ

সংগীতে বিরাজে।[৩৪]

শ্রীমতী নাচের বস্ত্র পরিহিত নটীর বেশ খুলে ফেলে। তার ভেতরে ভিক্ষুণীর পীতবস্ত্র পরিহিত দেখে সকলে শংকিত হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন; *বুদ্ধদেবকে নটী যে অর্ঘ্য দান করতে চেয়েছিল সে তার নৃত্য। অন্য সাধকেরা তাঁকে দিয়েছিল যা ছিল তাদেরই অন্তরতর সত্য, নটী দিয়েছে তার সমস্ত জীবনের অভিব্যক্ত সত্যকে। মৃত্যু দিয়ে সেই সত্যের চরম মূল্য প্রমাণ করেছে। এই নৃত্যকে পরিপূর্ণ করে জাগিয়ে তুলেছিল তার প্রাণমনের মধ্যে তার প্রাণের প্রাণ।*[৩৫]

শ্রীমতী পূজার ফল তো মৃত্যুদণ্ড। রত্নাবলী স্মরণ করে দিতে চায়, 'একেই কি পূজা বলে না? রক্ষিণী, তোমরা দেখছ। মহারাজ কী বিধান করেছেন মনে নেই?'[৩৬]

রক্ষিণী। শ্রীমতী তো পূজার মন্ত্র পড়েনি।

শ্রীমতী। (জানু পাতিয়া) বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি–

রক্ষিণী। (শ্রীমতীর মুখে হাত দিয়া) থাম্ থাম্ দুঃসাহসিকা, এখনো থাম্।

রত্নাবলী। রাজার আদেশ পালন করো।

শ্রীমতী। বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি

ধম্মং সরণং গচ্ছামি–

কিংকরীগণ। সর্বনাশ করিসনে শ্রীমতী, থাম্ থাম্।

রক্ষিণী। যাসনে মরণের মুখে উন্মত্তা।

দ্বিতীয় রক্ষিণী। আমি করজোড়ে মিনতি করছি আমাদের উপর দয়া করে ক্ষান্ত হ।

কিংকরীগণ। চক্ষে দেখতে পারব না, দেখতে পারব না, পালাই আমরা।

(পলায়ন)

রত্নবলী। রাজার আদেশ পালন করো।

শ্রীমতী। বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি

ধম্মং সরণং গচ্ছামি

সংঘং সরণং গচ্ছামি।[৩৭]

লোকেশ্বরী। (জানু পাতিয়া সঙ্গে সঙ্গে)

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি

ধম্মং সরণং গচ্ছামি

সংঘং সরণং গচ্ছামি।'[৩৮]

রক্ষিণী শ্রীমতীকে অস্ত্রাঘাত করতেই সে আসনের ওপর পড়ে গেল। "ক্ষমা করো ক্ষমা করো' বলতে বলতে রক্ষিণীরা একে একে শ্রীমতীর পায়ের ধুলা নিল।

লোকেশ্বরী। (শ্রীমতীর মাথা কোলে লইয়া) নটী, তোর এই ভিক্ষুণীর বস্ত্র আমাকে দিয়ে গেলি। (বসনের একপ্রান্ত মাথায় ঠেকাইয়া) এ আমার।

(রত্নাবলী ধূলিতে বসিয়া পড়িল)

তখন রত্নাবলী ব্যতীত সকলে উচ্চারণ করে:

সংঘং সরণং গচ্ছামি।

নত্থি মে সরণং অঞ্ঞ ঞংং বুদ্ধো মে সরণং বরং

এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং।[৩৯]

রত্নাবলী ছাড়া সকলেই স্থানত্যাগ করে রত্নাবলী শ্রীমতী মাথা নত করে পায়ে প্রণাম করে। তারপর রত্নাবলী উচ্চারণ করে:

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি

ধম্মং সরণং গচ্ছামি

সংঘং সরণং গচ্ছামি।[৪০]

এভাবে নাটকে নটী শ্রীমতীর আত্মোত্যাগের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের ত্যাগের মহিমা প্রচারিত হয়। একদিনের এই কাহিনীকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে নাটকটি রচিত হয়।

চণ্ডালিকা (১৯৩৩), নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা (১৯৩৮) ও শ্যামা (১৯৩৯) : এই নাটকটি শার্দূল-কর্ণাবদনের কাহিনী অবলম্বনে নৃত্যনাট্যরূপে রচিত। নাটকের উৎস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

'গল্পের ঘটনাস্থল শ্রাবস্তী। প্রভু বুদ্ধ তখন অনাথপিণ্ডদের উদ্যানে প্রবাস যাপন করছেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ একদিন এক গৃহস্থের বাড়িতে আহার শেষ করে বিহারে ফেরবার সময় তৃষ্ণা বোধ করলেন। দেখতে পেলেন, এক চণ্ডালের কন্যা, নাম প্রকৃতি, কুয়ো থেকে জল তুলছে। তার কাছ থেকে জল চাইলেন, সে দিল। তাঁর রূপ দেখে মেয়েটি মুগ্ধ হল। তাঁকে পাবার অন্য কোনো উপায় না

দেখে মায়ের কাছে সাহায্য চাইলে। মা তার জাদুবিদ্যা জানত। মা আঙিনায় গোবর লেপে একটি বেদী প্রস্তুত করে সেখানে আগুন জ্বালল এবং মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে একে একে ১০৮টি অর্কফুল সেই আগুনে ফেললে। আনন্দ এই জাদুর শক্তি রোধ করতে পারলেন না। রাত্রে তার বাড়িতে এসে উপস্থিত। তিনি বেদীর উপর আসন গ্রহণ করলে প্রকৃতি তাঁর জন্য বিছানা পাততে লাগল। আনন্দের মনে তখন পরিতাপ উপস্থিত হল। পরিত্রাণের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁর অলৌকিক শক্তিতে শিষ্যের অবস্থা জেনে একটি বৌদ্ধমন্ত্র আবৃত্তি করলেন। সেই মন্ত্রের জোরে চণ্ডালীর বশীকরণবিদ্যা দুর্বল হয়ে গেল এবং আনন্দ মঠে ফিরে এলেন।'[৪১]

এই নাটকটি রচিত হয়েছে মূলত জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে। তৎকালীন ভারতবর্ষে হিন্দুদের কুঃসংস্কার, অন্ধকারাচ্ছ, জাতিভেদের প্রভাব ছিল প্রবল। অস্পৃশ্যতার জাতাকলে মানুষের মধ্যে বৈষম্য দেখা দেয়, বুদ্ধই সে সংকট হতে মুক্তি দিয়েছেন। এতে রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর ভাবাবেগ সৃষ্টি করে এবং তাঁর মনে প্রতিশোধের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। তিনি নাটকে তুলে এনেছেন তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। যখন নাটকে মা তাকে সতর্ক করে দেন চণ্ডালকন্যার অশুচিতা ও অস্পৃশ্যতার কথা প্রকৃতি থেকে তখন ডাক আসে এবং বলে ওঠে :

'ছি ছি, মা, আবার তোকে বলছি, ভুলিস নে, মিথ্যে নিন্দে রটাস নে নিজের-পাপ সে পাপ! রাজার বংশে কত দাসী জন্মায় ঘরে ঘরে, আমি দাসী নই। ব্রাহ্মণের ঘরে কত চণ্ডাল জন্মায় দেশে দেশে, আমি নই চণ্ডাল।'

চণ্ডালকন্যা মনে করেন এই অপমান সহ্য করার মতো নয়। তাই দাসত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। এখানে কবি প্রকৃতিকে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন। কবি এই সাহস পেয়েছেন বুদ্ধের সাম্যনীতি থেকে। সাম্যনীতি হলো, প্রেম, প্রীতি, করুণা, মৈত্রী, ভালোবাসা। নাটকে দৃশ্যে বুদ্ধের মন্ত্র উচ্চারিত হয়–

বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণামহাণ্ণবো,
যাচ্চন্ত সুদ্ধব্বর এঞানলোচনো
লোকস্স পাপুপকিলেসঘাতকো
বন্দামি বুদ্ধং অহমাদরেণ তং।

এই নাটকটি মূলত জাতিভেদ প্রথা বিরোধী কেন্দ্র করে রচিত। হিন্দু সমাজের মধ্যে তথাকথিত জাতিভেদের ফলে যে অস্পৃশ্যতার জন্ম, রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। চন্ডালকন্যা

প্রকৃতিকে যখন তার মা তার অশুচিতা ও অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে চায়, তখন প্রকৃতি বলে; *'ছি ছি, মা, আবার তোকে বলছি, ভুলিস নে, মিথ্যে নিন্দে রটাস নে নিজের-পাপ সে পাপ! রাজার বংশে কত দাসী জন্মায় ঘরে ঘরে, আমি দাসী নই। ব্রাহ্মণের ঘরে কত চন্ডাল জন্মায় দেশে দেশে, আমি নই চণ্ডাল।'*

'পরিশোধ' কবিতা আর 'শ্যামা' নাটকের কাহিনী নেয়া হয়েছে মহাবস্তু-অবদান থেকে। ইন্দ্রমণির দুর্লভ হারটি বজ্রসেনের অধীনে। এই হার সে কারোর কাছে বিক্রি না করে বিনা মূল্যে দিতে চায়। সেই যোগ্য লোক খোঁজার জন্য বারাণসীর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কিন্তু রাজার কর্মচারীরা তার পেছনে পেছনে ছিলেন। যখন বারাণসীতে পরিত্যক্ত এক বাড়িতে রাত যাপন করার সময় চোর মনে করে তাকে ধরে ফেলে। চুরির অপরাধে তাকে বধ্যভূমিতে নেওয়ার পথে রাজনটীর শ্যামার সাথে দেখা হয়। শ্যামা বজ্রসেনকে দেখে প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু শ্যামার প্রেমে আত্মহারা উত্তীয়। তাই নিজের প্রাণ বিলিয়ে দিয়ের বজ্রসেনকে রক্ষা করে। অবশেষে বজ্রসেনকে নিয়ে শ্যামা পালিয়ে দেশ ছাড়ে। কিন্তু নির্দোষ উত্তীয়র নির্মম হত্যার কথা বজ্রসেন ভুলতে পারে না। উত্তীয়র আত্মত্যাগের কথা বজ্রসেন জেনে শ্যামাকে তীব্র ধিক্কার ও ভর্ৎসনা করে বলে;

কাঁদিতে হবে রে, রে পাপিষ্ঠা,
জীবনে পাবি না শান্তি।
এ জন্মের লাগি
তোর পাপামূল্যে কেনা
মহাপাপভাগী
এ জীবন করিলি ধিককৃত্
কলঙ্কিনী ধিক নিশ্বাস মোর,
তোর কাছে ঋণী।

বজ্রসেন শ্যামাকে প্রচন্ড আঘাত করে এবং তাকে ফেলে চলে যায়। বজ্রসেনও শ্যামাকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করে। রবীন্দ্রনাথ বজ্রসেনকে মানবিকতা ও তার মনে পাপবোধ জাগিয়ে তুলেছেন। শ্যামাকে ত্যাগ করেও তাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল বজ্রসেনের। তিনি শ্যামাকে ভেঙ্গেছে অন্তর থেকে;

'এসো এসো এসো প্রিয়ে,
মরণলোক হতে নূতন প্রাণ নিয়ে।'

তার ডাক শুনে শ্যামা এসেছে। এসে বলেছে;

এসেছি প্রিয়তম, ক্ষমো মোরে ক্ষমো।

গেল না গেল না কেন কঠিন পরান মম–

তব নিঠুর করুণ করে! ক্ষমো মোরে।

বজ্রসেন শ্যামাকে পেয়েও ধিক্কার দেয়। বলে,

‘কেন এলি, কেন এলি,

কেন এলি ফিরে।

যাও যাও যাও যাও, চলে যাও।’

বজ্রসেনকে প্রণাম করে শ্যামা চলে যায়। কিন্তু বজ্রসেন তখন আবার বিচলিত হয়ে উঠে এবং বলে;

ক্ষমিতে পারিলাম না যে

ক্ষমো হে মম দীনতা,

পাপীজনশরণ প্রভু।

মরিছে তাপে মরিছে লাজে

প্রেমের বলহীনতা–

ক্ষমো হে মম দীনতা,

পাপীজনশরণ প্রভু।

প্রিয়ারে নিতে পারি নি বুকে,

প্রেমেরে আমি হেনেছি,

পাপীরে দিতে শান্তি শুধু

পাপেরে ডেকে এনেছি।

জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে

যে অভাগিনী পাপের ভারে

চরণে তব বিনতা।

ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না

আমার ক্ষমাহীনতা,

পাপীজনশরণ প্রভু।’[৪২]

সবশেষে বজ্রসেন বুদ্ধেরই শরণ গ্রহণ করেন। তাঁর আদর্শের কাছেই আত্মসমর্পণ করে। এভাবেই 'শ্যামা' নাটকের সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাটকে সার্বজনীনতা, বুদ্ধ ও বৌদ্ধ প্রসঙ্গে : বিশ্বপরিমণ্ডলে রবীন্দ্রসাহিত্য একটি বিস্তৃত সাহিত্যভান্ডার। তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্ম সার্বজনীন আদর্শে সমৃদ্ধ। কবিগুরু গৌতম বুদ্ধের বিশ্বমৈত্রীর সাধনাকে জীবনবৃত্তের মূলতত্ত্ব হিসেবে গ্রহণ করে জাতি-বর্ণ-ধর্ম সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন। আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে সার্বজনীন সর্বমানবের বিশ্বমৈত্রীর এই কল্যাণবার্তা নিয়ে কবিগুরু বিশ্বপ্রদক্ষিণ করেছেন, এটি ছিল গৌতম বুদ্ধের প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। তাঁর সাহিত্যচর্চাতে বিশ্বমৈত্রীর গুণকে তিনি সেভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। কবিগুরু তাঁর বুদ্ধদেব বইতে 'ব্রহ্মবিহার'এ উল্লেখ করেছেন, অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে, যাকে ব্রহ্মবিহার বলে। যে প্রীতি সামান্য প্রীতি নয়, মা তাঁর একটি মাত্র পুত্রকে যে রকম ভালোবাসেন সেইরকম ভালোবাসা। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্ম-সাধনা সার্বজনীন চেতনায় পরিশুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ ধর্মান্ধতায় বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁর মধ্যে ছিল মানবতাবাদ। তিনি সমগ্র জীবনের সাহিত্যকর্মে অসাম্প্রদায়িক চেতনার ভাবধারাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যকর্মে মানবতার কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বুদ্ধের প্রেম, ত্যাগ, ভালোবাসা, সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন রবীন্দ্রনাথের জীবনকে আলোকিত করেছেন। 'সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু'- বিশ্বে সকল প্রাণী সুখী হোক, বিশ্বমৈত্রীর এই বাণী শুধু রবীন্দ্রনাথকে নয়, সমগ্র মানবজগতের অন্তরে জাগরিত করেছেন। প্রাণীর প্রতি তাঁর যে মৈত্রী, প্রেম, মহত্ত্ব; তা সকলের কাছে সমাদৃত। সার্বজনীন চেতনার সঙ্গে জড়িত রয়েছে মিত্রতার ভাবধারা বিষয়টি। বিশ্বজুড়ে মানুষে মানুষে মানবতার উৎকর্ষ সাধনে মানব মুক্তির সার্বজনীন চেতনার গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষে মানুষে মৈত্রী, সাম্য, ঐক্য ও পারস্পরিক বিশ্বাস এই চেতনার প্রধান দিক রবীন্দ্রনাথ নাটকে তুলে এনেছেন। সার্বজনীনতার আদর্শে কবিগুরু এই রকমভাবে তিনি তাঁর সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন। বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনে বিশ্বমৈত্রী একটি সার্বজনীন আদর্শ। বিশ্ব প্রাণীজগতের প্রতি বিশ্বমৈত্রীর বার্তা সার্বজনীন বার্তা হিসেবে প্রতিভাত। কবিগুরু তাঁর রচিত নাটকে বুদ্ধের সার্বজনীনতার আদর্শকে সম্যকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বুদ্ধের ধর্মদর্শনে অহিংসা ও করুণাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মূলত পুরো বৌদ্ধ সংস্কৃতি এই অহিংসা ও করুণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। গৌতম বুদ্ধ ছিলেন মহাকারুণিক। প্রাণীজগতের প্রতি দয়াপরবশত হয়ে করুণাবশত বুদ্ধ তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম প্রাণীজগতের কল্যাণে প্রচার করেছিলেন। বুদ্ধের ধর্ম আমরা এককথায় বলতে পারি কল্যাণ ধর্ম। বুদ্ধ শিষ্যদের কল্যাণ ধর্ম অর্থাৎ আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ ধর্ম প্রচারের জন্য দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে বলেছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে অহিংসা ও করুণার মহিমা বিশেষভাবে কীর্তিত হয়েছে। বুদ্ধের এই সার্বজনীনতার আদর্শ

বিশ্ববাসী শান্তির প্রয়োজনে গ্রহণ করার জন্য উন্মুখ ছিল। তাই কবি এই হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকে বাঞ্ছনীয় মনে করে বলেছিলেন, 'নূতন তব জনম লাগি কাতর যত প্রাণী'। 'রাজর্ষি' ও 'বিসর্জন' গ্রন্থে কবিগুরু প্রাণি হিংসা বা হত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। বিশ্বমৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, অহিংসা, দয়া, সহনশীলতা, ক্ষমা প্রভৃতি গুণের আদর্শে সার্বজনীনতার সার্বিক বহিঃপ্রকাশ ইত্যাদি বুদ্ধের ধর্মের বা বৌদ্ধ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। কবিগুরু যথার্থই বুদ্ধের বাণীতে বিধৃত এইসব গুণাবলীকে গ্রহণ করে সাহিত্যে তিনি সৃষ্টিশীলতা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর বহু গান, কবিতায় ও নাটকে বুদ্ধকে এবং তৎপ্রবর্তিত জীবনদর্শনে প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যকর্মে সংঘশক্তির সার্বজনীনতাকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন, সংঘই সর্বশক্তির উৎসকেন্দ্র। মূলত বুদ্ধ সংঘশক্তিকে একটি মহাশক্তি হিসেবে দেখেছেন। এই মহাশক্তির আশ্রয়ে সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোক দিগবিজয়ের লোভ ত্যাগ করে ধর্মবিজয়ের পথ বেছে নিয়েছিলেন। সর্বসাধারণের সার্বজনীন কল্যাণে প্রিয়দর্শী অশোক ধর্মবিজয়ের পথে বুদ্ধের অন্তর্নিহিত ধর্মকে প্রায়োগিক অর্থে প্রচার ও প্রসার করেছিলেন। সম্রাট অশোকের ব্যবস্থার ফলেই বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন মানব ধর্ম হিসেবে বিশ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করে সর্বজনীন জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন ভারতবর্ষ এ ধর্মবিজয়ের পতাকা কালক্রমে একদিকে গ্রিস মেসিডোনিয়া ও মিসর সাইরিনি থেকে অপর দিকে চীন-তিব্বত ও কোরিয়া-জাপান পর্যন্ত সগৌরবে স্বমহিমায় মহিমান্বিত হয়ে জগদ্বাসীকে উদ্ভাসিত করেছিল। কবিগুরু বৌদ্ধধর্মে সংহতিশক্তির সর্বোত্তম বিকাশ দেখেছেন। সংঘশক্তির বিকাশ জাতীয় জীবনে সার্বজনীনভাবে প্রোথিত দেখে কবিগুরু প্রতিনিয়ত উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাই কবি বলেছেন;

ত্রিশরণ মহামন্ত্র যবে
বজমন্ত্র রবে
আকাশে ধ্বনিতেছিল পশ্চিমে পূরবে...

এর সংগে এটা অনুধাবন করা সম্ভব কবিগুরু সর্বাঙ্গীণ জীবনের সার্বজনীন বিকাশে বৌদ্ধ সংহতিও সংস্কৃতির মধ্যে ভারতীয় জীবনে অসাধারণ ভূমিকা দেখেছেন। বুদ্ধের সমস্ত উপদেশে কবিগুরু কোথাও বিচ্ছিন্নতার, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতার কোনো আভাস দেখেননি। শুধু দেখেছেন মানবিক মূল্যবোধ, মানবিকতা, মানবতার স্ফুরণ। বিচ্ছিন্নতাবাদী সত্তার বিরুদ্ধে কবিগুরু সবসময় সোচ্চার ছিলেন। তাই কবি বলেছেন, বুদ্ধের ধর্ম সর্বমানবের সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের সমতার বিষয়টি কবিগুরুকে বেশি আকৃষ্ট করে। আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি বুদ্ধ কোনটিই কোন গোষ্ঠীর জন্য ধর্মপ্রচার করেননি। মানবজাতি তথা প্রাণিকুলের কল্যাণে তাঁর ধর্ম। তাই অবশ্যই সমতার আদর্শের বিষয়টি বুদ্ধের ধর্মে সুস্পষ্ট। কবিগুরু মতো মহান কবির তাই বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন ইহাই স্বাভাবিক। কবিগুরু তাঁর সাহিত্যে, নাটকে, গানে, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে তাই

কোনো বিশেষ শ্রেণির স্বার্থের বিষয়েটি স্থান পায়নি বলে আমার ধারণা। 'মালিনী' নাটকে কবিগুরু বুদ্ধের বিশ্বজনীনতাকে ব্রাহ্মণ্য সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যথাযথভাবে উপস্থাপন করেছেন। 'নটীর পূজা', 'চণ্ডালিকা' প্রভৃতি নাটকে জাতিভেদের বিরুদ্ধে কবিগুরুর শাণিত ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। 'নটীর পূজা' নাটকে কবিগুরু বৌদ্ধধর্মের মহত্বকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গৌতম বুদ্ধ মূলত তৎকালীন ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে বিপ্লব করেছেন বলা যায়। তাই তাঁর ধর্মে উপালি নাপিতের মতো বহুজন স্থান পেয়েছে এবং উচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বুদ্ধের এই বিপ্লবকে সমাজবিপ্লব বলা যেতে পারে। জ্ঞানের চিত্তাকাশে বিপ্লবের প্রতিধ্বনি বিনা অস্ত্রে মানব বিশ্বকে উদ্ভাসিত করেছিল। তাই বৌদ্ধ সংস্কৃতি ভারত সংস্কৃতিকে বিশ্বমৈত্রী, ত্যাগ, করুণা, অহিংসা, ঐক্য, সংঘশক্তি ও মানবের সমতার সংস্কৃতি দ্বারা প্লাবিত করেছিল এবং রবীন্দ্র ভাবধারার মধ্যে তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছিল। বিসর্জন, রাজর্ষি, বাল্মিকী প্রতিভা, কালমৃগয়া প্রভৃতি নাটকে কবিগুরু বুদ্ধের অপরিমেয় মৈত্রীকে তাঁর চিন্তাভাবনায় উদ্ভাসিত করেছেন এবং ভারতীয় নাট্য সংস্কৃতিকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করে সর্বজনীন আদর্শকে সমুন্নত রাখার জ্ঞানদীপ্ত প্রয়াস চালিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধকে উপলব্ধি করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানবরূপে। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে ছিল জীবনের চঞ্চলচিত্তকে অতিক্রম করে সত্য সন্ধানের দিকে প্রতিষ্ঠিত করা। আধ্যাত্মিকতা আমাদের ঔদাসীন ও অসাড়তাকে শান্তভাব আনার প্রক্রিয়া বিশেষ। তাঁর সমগ্র চেতনার মধ্যে একটা নিগূঢ় অধ্যাত্ম অনুভূতি ছিল, যা সেই অনুভূতিই তাঁর সাহিত্যচেতনায় প্রবাহিত হয়। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মসাধনা সার্বজনীন চেতনায় পরিশুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ ধর্মান্ধতায় বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁর মধ্যে ছিল মানবতাবাদ। তিনি সমগ্র জীবনের সাহিত্যকর্মে অসাম্প্রদায়িক চেতনার ভাবধারাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যকর্মে মানবতার কথা ব্যক্ত করেছেন। বুদ্ধের প্রেম, ত্যাগ, ভালোবাসা, সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। ব্রহ্মবিহারে চার প্রকার ভাবনা মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা। রবীন্দ্রনাথের রচিত নাটক পর্যালোচনায় উপরি-উক্ত ধারণার মধ্যে বুদ্ধের মৌলিক শিক্ষা মৈত্রী ও করুণা তথা অহিংসা ও ক্ষমার আদর্শ ফুটে ওঠেছে। বিশেষ করে বিসর্জন, মালিনী ও নটীর পূজা নাটকে লক্ষ করা যায়। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে গান্ধীজির সামাজিক আন্দোলনের মতো তিনিও অন্ধসংস্কার, কুসংস্কার, অস্পৃশ্যতা সংস্কারের বিরুদ্ধে অচলায়তন ও চণ্ডালিকা নাটক রচনায় মানবিক সত্য, সাম্য মৈত্রী করুণা ও সভ্যতার জয় গান আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করা। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি প্রেরণা ও দর্শন-চেতনার মূল উৎস মৈত্রী। জ্ঞান ও কর্মের উৎসস্থল হচ্ছে বিশ্বমৈত্রী। কবি মৈত্রী সাধনায় উদ্ভাসিত হয়ে মানব প্রেমের জয়গান গেয়েছেন। মানবপ্রেম হতে জীবপ্রেম জীবনের প্রতি প্রবল অনুরাগই মূল যার আশ্রয় কখনোও রাজধর্ম, কখনো দেবধর্ম, কখনো মানবধর্ম। শ্যামা নাটকে শ্যামার প্রতি যে অমানবিক অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি ক্ষমা করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কবি তা এই নাটকে তুলে এনেছেন। শান্তিনিকেতন, ধর্ম, মানুষের ধর্ম রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা ও মৈত্রীসাধনার দলিল। এখানে মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তন সাধনের

দিকটি ফুটে উঠেছে। প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিকতা ও মৈত্রী সাধনার আদর্শ কবির নিজের জীবনে পরিপূর্ণতা সাধন হয়েছে কেবল নয়, পুরা হিন্দুসমাজের জীবনযাত্রা পরিবর্তন হয়েছে। 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে কবি বলেন ধর্ম কেবল আচার সর্বস্বতা নয় ধর্ম হলো যা ধারণ করে জীবপ্রেমই তা-ই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ মহামানব গৌতম বুদ্ধের সার্বজনীনতা বিষয়ে শুধু নাটকে নয়, প্রবন্ধে, কবিতায়, উপন্যাসে, গানেও প্রকাশ পায়। বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্ত্বা ও মানবিক মূল্যবোধকে বিকশিত করেছে বহুমাত্রিকভাবে। বুদ্ধের সামগ্রীক জীবনদর্শন ও সর্বজনীন চেতনায় রবীন্দ্রনাথের জীবানাদর্শে আপন মহিমায় আলোকিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সেই সর্বজনীনতার আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়। রবীন্দ্র সংস্কৃতির ইহাই সার্বজনীনতার বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্য।

উপসংহার : আলোচনায় বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের মূল দর্শন বা বুদ্ধবাণীর বিশেষত্ব হচ্ছে সার্বজনীনতা। এই সার্বজনীনতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে সুস্পষ্টভাবে তুলে এনেছেন। বুদ্ধের সর্বজনীনতা অন্যান্য ধর্মের মানুষকে ধর্মপ্রবর্তকের উপর পূর্ণ আনুগত্য স্থাপন করে ধর্মে অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু বুদ্ধের ধর্ম পালন করার জন্য বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়না। বুদ্ধের ধর্ম বাস্তবভিত্তিক সত্য ধর্ম, যে ধর্মে আছে প্রেম, মৈত্রী, সাম্য, দয়া, ক্ষমা, করুণা, অহিংসার অমিয় বাণী। বুদ্ধের মধ্যে সর্বজনীন চেতনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শে বুদ্ধের আদর্শকে অনুসরণ করেছেন। তিনি তাঁর সাহিত্যে বিশেষ করে প্রবন্ধে, কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে আপন মহিমা তুলে এনেছেন। বুদ্ধের সর্বজীবের অমৃতময় মৈত্রীর বাণী প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিলেন। হিংসাকে মৈত্রীর দ্বারা, অসত্যকে সত্যের দ্বারা জয় করেছিলেন। লোভ, দ্বেষ, মোহ, অহংকার ও বিদ্বেষে মানবসভ্যতাকে এক মহাসংকটের দিকে নিয়ে যায়। আজকের হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে বুদ্ধবাণীই মানবসভ্যতাকে কল্যাণে সমুজ্জ্বল করতে পারবে। তাই কবির আকুল প্রার্থনা ছিল মহামানব বুদ্ধের আবির্ভাবের কথা। বুদ্ধ তথা বুদ্ধবাণী ভারতবর্ষে সকল মানুষের অন্তর জয় করেছেন। বুদ্ধ তথা বৌদ্ধসংস্কৃতি ভারতবর্ষে আপন মহিমার মাধ্যমে অন্তর জয় করার প্রধানত রবীন্দ্রনাথের সুদৃষ্টি। বৌদ্ধধর্ম কোনো সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়, এই ধর্ম মানব ধর্ম তথা মানুষের অন্তরকে বিকশিত করার শ্রেষ্ঠ ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ এশিয়ায় বৌদ্ধ অধ্যুষিত দেশগুলো পরিভ্রমণ করে যে সত্য উপলব্ধি করেছেন, তা বিশ্বমৈত্রীর এক জয়গান। এশিয়া তথা বিশ্বপরিভ্রমণের মূলেও ছিল মৈত্রী ও প্রেমের আদর্শের সাধনা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে বিশেষ করে কবিতায়, প্রবন্ধে, উপন্যাসে ও নাটকে সর্বত্রই বুদ্ধ ও বৌদ্ধসংস্কৃতির মহামহিমা সমুজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তবে রবীন্দ্রসাহিত্যে বৌদ্ধসংস্কৃতির মহিমা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যজগতে তা বিরল। এখানেই অন্য কবির সাথে রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধভাবাদর্শের পার্থক্য।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৪২৩, পৃ. ১।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৬।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮।
১৪. সুধাংশুবিমল বড়ুয়া, *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, মিলনপল্লী কো-অপারেটিভ, কলকাতা, ১৩৯৫, পৃ. ১৬৭।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮-৬৯।
১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০৬, পৃ. ৪৩৪।
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৫।
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪১।
১৯. আশা দাশ, *বৌদ্ধধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ*, *মহাবোধি বুক এজেন্সী*, *কলকাতা*, ২০১৩, পৃ.৫- ৬।
২০. সুধাংশুবিমল বড়ুয়া, *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি*, মিলনপল্লী কো-অপারেটিভ, কলকাতা, ১৩৭৪, পৃ. ১৭৫।
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫।
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪।
২৩. জ্যোতিপাল মহাথেরে, ***রবীন্দ্রসাহিত্য বৌদ্ধসংস্কৃতি***, অন্তিকা প্রেস, চট্টগ্রাম, ১৯৯৭, পৃ. ২০।
২৪. *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪।
২৫. *রবীন্দ্রসাহিত্য বৌদ্ধসংস্কৃতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯।
২৬. *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১।
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।
৩০. *রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৪।
৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০৬, পৃ. ৩০০।
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১।
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১।
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১-৩২২।
৩৫. *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯-১৮০।
৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ২৫০।
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০।

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১।

৪১. *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০; *Sanskrit Buddhist Literature of Nepal, p. 223.*

৪২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ২০২।

উপসংহার

বিষয়বস্তুকে চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছি। প্রথম অধ্যায়ে বৌদ্ধ সাহিত্যের পরিচয় তুলে ধরেছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন্ কোন্ সাহিত্যকর্ম হতে ভাবধারা গ্রহণ করে নাটক রচনা করেছেন তা চিহ্নিত করার সুবিধার্থে প্রথম অধ্যায়ে বৌদ্ধ সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেছি। পর্যালোচনায় দেখা যায়, বৌদ্ধ সাহিত্য দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত। যথা : পালিসাহিত্য এবং বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য। পালি ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ পালি সাহিত্য, অপরদিকে সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ সংস্কৃত সাহিত্য নামে অভিহিত। উভয় ধারায় বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার রয়েছে। বিষয়বস্তুর আঙ্গিকে পালি সাহিত্যকে নিম্নরূপভাবে ভাগ করা যায় :

ত্রিপিটক : পালি সাহিত্যের মধ্যে সর্ব প্রাচীন হচ্ছে ত্রিপিটক। ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। ত্রিপিটকে গৌতম বুদ্ধের সকল ধর্মবাণী সংকলিত আছে। ত্রিপিটক তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। যথা : সূত্রপিটক, বিনয়পিটক এবং অভিধর্ম পিটক। বুদ্ধ সূত্রাকারে যেসব ধর্মবাণী দেশনা করেছেন তা সূত্র নামে অভিহিত। সূত্র সমূহ সূত্রপিটকে সংকলিত আছে। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সংঘের জীবনকে বিশুদ্ধভাবে পরিচালিত করার জন্য বুদ্ধ অনেকগুলো বিধি-বিধান বা নিয়ম প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন, যা বিনয় নামে অভিহিত। বিধি-বিধান বা বিনয়গুলো বিনয়পিটকে সংকলিত আছে। বুদ্ধের দর্শন বিষয়ক আলোচনা সমূহ অভিধর্ম নামে অভিহিত, যা অভিধর্ম পিটকে সংকলিত আছে। ত্রিপিটকে অনেকগুলো গ্রন্থের সমাহার রয়েছে। নিচে ত্রিপিটকের গ্রন্থসমূহ তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করে ছকে প্রদর্শন করা হলো :

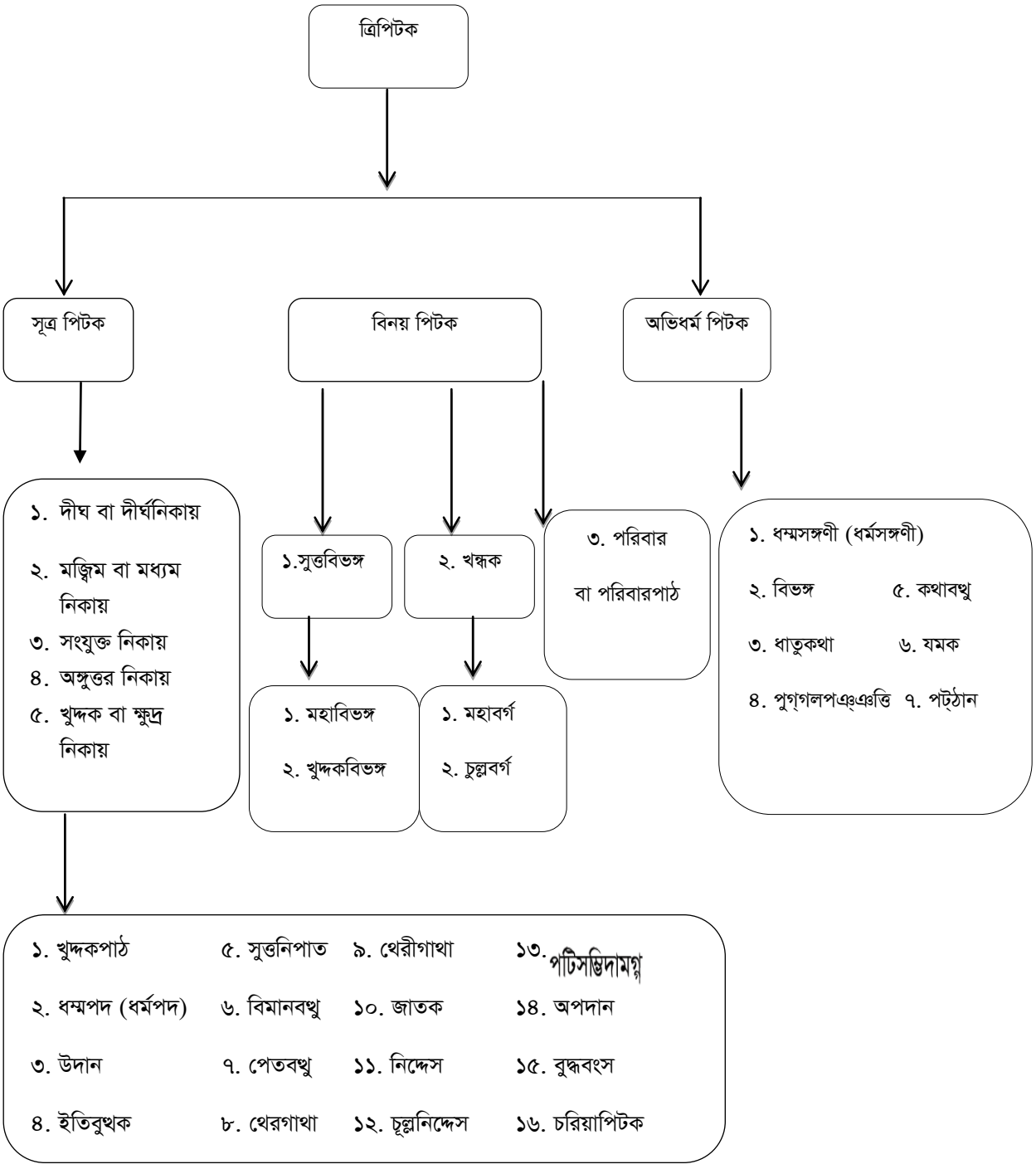
ত্রিপিটক
সূত্র পিটক
বিনয় পিটক
অভিধর্ম পিটক
১. দীঘ বা দীর্ঘনিকায়
২. মজ্ঝিম বা মধ্যম নিকায়
৩. সংযুক্ত নিকায়
৪. অঙ্গুত্তর নিকায়
৫. খুদ্দক বা ক্ষুদ্র নিকায়
১.সুত্তবিভঙ্গ
২. খন্ধক
৩. পরিবার বা পরিবারপাঠ
১. মহাবিভঙ্গ
২. খুদ্দকবিভঙ্গ
১. মহাবর্গ
২. চুল্লবর্গ
১. ধম্মসঙ্গণী (ধর্মসঙ্গণী)
২. বিভঙ্গ
৩. ধাতুকথা
৪. পুগ্গলপঞ্ঞত্তি
৫. কথাবত্থু
৬. যমক
৭. পট্ঠান
১. খুদ্দকপাঠ
২. ধম্মপদ (ধর্মপদ)
৩. উদান
৪. ইতিবুত্থক
৫. সুত্তনিপাত
৬. বিমানবত্থু
৭. পেতবত্থু
৮. থেরগাথা
৯. থেরীগাথা
১০. জাতক
১১. নিদ্দেস
১২. চূল্লনিদ্দেস
১৩. পটিসম্ভিদামগ্গ
১৪. অপদান
১৫. বুদ্ধবংস
১৬. চরিয়াপিটক

ত্রিপিটক বর্হিভূত মৌলিক গ্রন্থ : ত্রিপিটকে পরবর্তীকালে এবং অট্ঠকথার পূর্বে বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের বিশ্লেষণ ধর্মী এক প্রকার রয়েছে, যা ত্রিপিটক বর্হিভূত মৌলিক গ্রন্থ নামে পরিচিত। এরূপ গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : সুত্তসংগহ, পেটকোপদেস, নেত্তিপকরণ এবং মিলিন্দপঞ্ঞ।

অট্ঠকথা : ত্রিপিটকে সংকলিত বুদ্ধবাণীতে অনেক দুর্বোধ্য, দ্ব্যর্থক ও জটিল বিষয় রয়েছে। সেসব বিষয়ের সহজ-সরল ব্যাখ্যা স্বরূপ পালি ভাষায় এক ধরণের সাহিত্যকর্ম রচিত হয়, যা অট্ঠকথা নামে পরিচিত। ত্রিপিটকের সকল গ্রন্থের অট্ঠকথা রচিত হয়েছে। বুদ্ধঘোষ, বুদ্ধদত্ত, ধর্মপাল, উপসেন, মহানাম প্রমুখ মহাপণ্ডিতগণ অট্ঠকথা সমূহ রচনা করেন।

টীকা-অনুটীকা : অট্ঠকথায় বর্ণিত বিষয় নিয়েও পালি ভাষায় সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছে, যা টীকা-অনুটীকা নামে পরিচিত। সমীক্ষায় দেখা যায়, পালি ভাষায় রচিত **১৩**টি টীকা গ্রন্থ এবং ৪টি অনুটীকা গ্রন্থ রয়েছে।

বংসসাহিত্য : পালি ভাষায় ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নিয়ে এক প্রকার সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছে, যা বংসসাহিত্য নামে পরিচিত। এ ধরণের গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : দীপবংস, মহাবংস, গন্ধবংস, সদ্ধম্মসংগহ, সাসনবংস ইত্যাদি।

এছাড়া, পালি ভাষায় সারগ্রন্থ, সংকলন গ্রন্থ, অধিবিদ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থ, কাব্য গ্রন্থ, গল্প সংগ্রহ, ব্যাকরণ ও শব্দকোষ, ছন্দ-অলংকার, নীতিশাস্ত্র, জীবনী গ্রন্থ, চিঠি-অনুশাসন, দর্শন, কানুনিক প্রভৃতি ধরণের গ্রন্থও রচিত হয়।

অপরদিকে, বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য ও নানা আঙ্গিকের বিষয়বস্তুর সমাহারে ঋদ্ধ। সংস্কৃত ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। পালি সাহিত্য ভাণ্ডার অপেক্ষা বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারের পরিধি বহুগুণ বিস্তৃত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ললিতবিস্তর, মহাবস্তু, বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ, সদ্ধম্মপুণ্ডরিক, সুখাবতিব্যুহ, প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র, লংকাবতারসূত্র, সুবর্ণপ্রভাসসূত্র, কারণ্ডব্যুহসূত্র, গণ্ডব্যুহসূত্র, মাধ্যমিক কারিকা, বোধিচর্যাবতার, শিক্ষাসমুচ্চয়, অভিধর্মকোষ, অবদানশতক, অশোকাবদান, অবদানকল্পলতা, দিব্যাবদান ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বৌদ্ধ সাহিত্য বৈচিত্র্যময় এবং নানা আঙ্গিকের সাহিত্য রচনার অনন্য উৎস।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিতে বুদ্ধ' সম্পর্কে আলোচনা করেছি। বুদ্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তা-চেতনা কিরূপ ছিল এবং বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন তাঁর মননে কীরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল তা অনুসন্ধান করার

জন্য এই অধ্যায়টি অবতারণা করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনা থেকে জানা যায় যে, বুদ্ধের জীবন-দর্শন রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান, নাটক, গল্প, উপন্যাস, গীতি-নাট্য এবং চিন্তন ও মননে বৌদ্ধ ভাবাদর্শ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধ মূল্যবোধ ও ভাবাদর্শ তাঁর চিন্তা-চেতনাকে বিমোহিত করেছিল বলেই তিনি বুদ্ধকে আদর্শ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং দ্ব্যর্থ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন :

পাষাণের মৌনতটে যে-বাণী রয়েছে চিরস্থির–

কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর

আকাশে উঠিছে অবিরাম

অমেয় প্রেমের মন্ত্র– 'বুদ্ধের স্মরণ লইলাম।'

তৃতীয় অধ্যায়ে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্মে বৌদ্ধ প্রভাব' সম্পর্কে আলোচনা করেছি। নাটক ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সাহিত্যকর্মে বৌদ্ধ প্রভাব রয়েছে কিনা তা জানার জন্য এই অধ্যায়টি উপস্থাপন করেছি। সমীক্ষায় দেখা যায়, ররীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার বৌদ্ধ সংস্কৃতির বলয়ে ছিল আচ্ছন্ন। তিনি নিজেও বৌদ্ধ সংস্কৃতির লালন ক্ষেত্র সমূহ আন্তরিক তাঁর সঙ্গে পরিভ্রমণ করেছেন। বৌদ্ধ সংস্কৃতির অনন্য উপাদান বা মূল্যবোধগুলো, বিশেষত সাম্যবাদ, উদারতা, সহিষ্ণুতা, মানবতাবাদ, সর্বপ্রাণীর কল্যাণ কামনা প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, যা তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মে নানাভাবে প্রতিভাত করেছেন। বৌদ্ধ সাহিত্যের উপর্যুক্ত বিষয় সমূহ তাঁর সাহিত্যে এক বিশেষ জায়গা দখল করে আছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে মূল আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে বৌদ্ধ প্রভাব সম্পর্কে সমীক্ষা করেছি এবং উক্ত সমীক্ষার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কোন নাটক কোন কোন বৌদ্ধ উৎস হতে ভাব গ্রহণ করে রচিত হয়েছে তা চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা করেছি। উক্ত বিষয়ে আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক সমূহের মধ্যে রাজা, মালিনী, নটীরপূজা, চণ্ডালিকার কাহিনী, ধরন, চরিত্র বৌদ্ধ সংস্কৃতি কেন্দ্রিক। উক্ত নাটক সমূহের মূল উৎস হচ্ছে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধ অবদান শতক গ্রন্থ। উক্ত নাটক সমূহে তিনি সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বৈষম্য ও কুসংস্কারের বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ অচলায়তন নাটকের উৎস গ্রহণ করেছেন দিব্যাবদান গ্রন্থ হতে। এই নাটকে গণ্ডিবদ্ধ শিক্ষার অচলায়তন ভেঙ্গে বৌদ্ধ ভাবাদর্শের শিক্ষার দ্বারকে উন্মুক্ত করা হয়েছে। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, যে শিক্ষা চিত্ত জগতকে জাগরিত করে না এবং বিমুক্ত করে না সেই শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নয়। রবীন্দ্রনাথ 'রাজা' নাটকটি কুশজাতক হতে কাহিনী সংগ্রহ করে রচনা করেছেন। উক্ত নাটকের কাহিনী সংস্করণ করে তিনি

অরূপরতন নাটকটি রচনা করেন। নটীরপূজা নাটকের উৎসও রবীন্দ্রনাথ অবদান শতকগ্রন্থ হতে সংগ্রহ করেছেন। চণ্ডালিকা নাটকটি অবদান শতকের শার্দূল-কর্ণাবদান কাহিনীর আলোকের রচিত। এই নাটকে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ লক্ষ করা যায়, যা বুদ্ধের জীবন-দর্শনের অনন্য বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে বলা যায়, বুদ্ধের জীবন-দর্শনের বিশেষত্ব হচ্ছে সার্বজনীনতা, যা রবীন্দ্রনাথের নাটকে স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। বুদ্ধের চারি অপ্রেমেয় দর্শন অর্থাৎ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

পরিশেষে উপসংহারে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করেছি। প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের অধিকাংশ কাহিনীই বৌদ্ধ সাহিত্য হতে সংগ্রহ করেছেন এবং বৌদ্ধ মূল্যবোধ, যেমন– সাম্যবাদ, উদারতা, সহিষ্ণুতা, মানবতাবাদ, সর্বপ্রাণীর কল্যাণ কামনা প্রভৃতি তাঁর নাটকের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে।

গ্রন্থপঞ্জি

সহায়ক গ্রন্থ : পালি

ভিক্ষু শীলভদ্র (অনু) (১৩৫৩)। *দীঘনিকায়*, ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড। মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা।

বেণীমাধব বড়ুয়া (অনু) (১৯৪০)। *মজ্ঝিমনিকায়*, ১ম খণ্ড। যোড়েন্দ্র রূপসীবাংলা ত্রিপিটক বোর্ড, কলকাতা।

ধর্মাধার মহাস্থবির (অনূ) (১৯৫৬)। *মজ্ঝিমনিকায়*, ২য় খণ্ড। বৌদ্ধ ধর্মাংকুর বিহার, কলকাতা।

দাশ আশা (২০০৩)। *দ্বীপবংশ*। *করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।*

মহাস্থবির ধর্মাধার (অনু) (১৯৫৪)। *ধম্মপদ*। বৌদ্ধ ধর্মাংকুর সভা, কলকাতা।

বড়ুয়া ধর্মরাজ (১৮৯৩)। *হস্তসার*। মোহন প্রেস, কলকাতা।

মহাস্থবির সাধনানন্দ (১৯৮৭)। *সুত্ত নিপাত*। কথামালা প্রকাশনী, ঢাকা।

সহায়ক গ্রন্থ : বাংলা

গুপ্ত দাশ নলিনীনাথ (১৩৫৫)। *বাংলায় বৌদ্ধধর্ম*। এ মুখার্জী এন্ড কোং লি:, কলকাতা।

গুপ্ত দাশ শশীভূষণ (১৩৯০)। *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি*। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা।

গুপ্ত তমোনাশ চন্দ্র দাশ (১৯৫১)। *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

ঘোষ অজিতকুমার (১৯৭৩)। *বাঙলা নাটকের ইতিহাস*। জেনারেল প্রিন্টাস অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

ঘোষ অজিত কুমার (১৩৫৩)। *বাংলা নাটকে ইতিহাস।* জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিসার্স (প্রা:) লি:, কলিকাতা।

ঘোষ গিরিশচন্দ্র (১২৯২)। *বুদ্ধদেব চরিত*। ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা।

ঘোষ ঈসান চন্দ্র (১৩৮৪-৮৬), *জাতক*, *১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড*। করুনা প্রকাশনী, কোলকাতা।

ঘোষ জ্যোতিষচন্দ্র (১৩৬২)। *ঘোষ, বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ*। এ মুখার্জী এন্ড কোং লি:, কলকাতা।

ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ (১৯১৬)। *অবনীন্দ্র রচনাবলী*। ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

চক্রবর্তী অজিত কুমার (১৩৫১)। *কাব্যপরিক্রমা*। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

চক্রবর্তী অজিত কুমার (১৩৫৩)। *রবীন্দ্রনাথ।* বিশ্বভারতী, কলকাতা।

চাকমা নীরুকুমার (১৯৯৬)। *বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম ও দর্শন*। মিনার্ভা পাবলিকেশন, ঢাকা।

চৌধুরী বিনয়েন্দ্রনাথ (২০০৭)। *বৌদ্ধ সাহিত্য*। মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা।

চৌধুরী সাধক শিশির বড়ুয়া (২০১৭)। *ত্রিপিটক পরিচিতি*। ইন্টারস্পেস মার্কেটিং এন্ড কমিউনিকেশন, চট্টগ্রাম।

চৌধুরী সাধনকমল (২০০৫)। *থুপবংশ*। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

চৌধুরী সাধনকমল (২০০২)। *বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বাঙালী বৌদ্ধদের ক্রমবিকাশ*। করুনা প্রকাশনা, কলকাতা।

চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার (১৩৭১)। *রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ।* কে.এম প্রেস, কলকাতা।

জাকারিয়া সাইমন (২০০৭)। প্রাচীন বাংলা বুদ্ধ নাটক। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

দাস আশা (১৯৬৯)। *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। ক্যালকাটা বুক হাউস, ঢাকা।

দাশ আশা (২০০১)। *বৌদ্ধধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ*। মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা।

বড়ুয়া জগন্নাথ (২০১৪)। *বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*। নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা।

বড়ুয়া জগন্নাথ (২০০৯)। *মহাকাব্য ও মহাকবি অশ্বঘোষের কাব্যদর্শ*। শোভা প্রকাশ, ঢাকা।

বড়ুয়া প্রণব কুমার (২০০৮)। *বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

বড়ুয়া শিমুল (১৪১৮)। *করুণাঘন ধরনীতল কর'কলঙ্কশূন্য*। বাংলাদেশ বৌদ্ধ একাডেমী, ঢাকা।

বড়ুয়া দিলীপ কুমার (২০১০)। *পালি ভাষার ইতিবৃত্ত*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বড়ুয়া সুধাংশু বিমল (১৩৭৪)। *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি।* মিলনপল্লী কো-অপারেটিভ, কলকাতা।

বড়ুয়া রবীন্দ্র বিজয় (১৯৮৪-৮৬)। *পালি সাহিত্যের ইতিহাস* ***১ম*** *খন্ড ও* ***২য়*** *খন্ড*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

বড়ুয়া রেবত প্রিয় (১৯৯৩)। *বিশুদ্ধিমার্গ বৌদ্ধতত্ত্ব*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বড়ুয়া সুনন্দা (১৯৯৩)। *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বড়ুয়া সুধাংশুবিমল (১৩৭৩)। *বিশ্বভারতীতে বৌদ্ধশাস্ত্র-চর্চা, চিত্রাঙ্গদা*।

বড়ুয়া ডি.পি. (২০০৬)। *বাঙালি বৌদ্ধদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য।* জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা।

বড়ুয়া দিলীপ কুমার (সম্পা.), (২০০৫)। *গন্ধবংস*। আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা।

বড়ুয়া দিলীপ কুমার ও বিমান চন্দ্র বড়ুয়া (অনু.ও সম্পা.) (২০০৮)। *সদ্ধম্ম-সংগহো*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বড়ুয়া দিলীপ কুমার ও সুমন কান্তি বড়ুয়া (২০০৮)। *কীর্তিমান বৌদ্ধসাহিত্যিক ও দার্শনিক*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বড়ুয়া দিলীপ কুমার বড়ুয়া (সম্পা.) (২০০৮)। *গন্ধবংস*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বড়ুয়া সুকোমল (সম্পা) (২০০৮)। *মহামানব গৌতম বুদ্ধ*। মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা।

বড়ুয়া সুদর্শন(সং ও সম্পা) (২০০৭)। *ত্রিপিটক পরিচিতি*। ময়নামতি আর্ট প্রেস, চট্টগ্রাম, ।

বড়ুয়া সুকোমল ও সুমন কান্তি বড়ুয়া (২০০০)। *ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বড়ুয়া সুমন কান্তি (২০০৫)। *বোধিচর্যাবতার গ্রন্থে বৌদ্ধ পারমীতত্ত্ব*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বড়ুয়া শান্টু (২০০৯)। ঐতিহাসিক পালি বংস সাহিত্য সমীক্ষা। আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা।

বড়ুয়া দিলীপ কুমার (২০১০)। *পালি ভাষার ইতিবৃত্ত*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বন্দোপাধ্যায় অসিত কুমার (১৯৭৩)। *বাংলা সাহিত্যে ইতিবৃত্ত*। মডার্ণ বুক এজেন্সী (প্রা:) লি:, কলিকাতা।

ব্রহ্মচারী শীলানন্দ (১৯৮৪)। *বিশুদ্ধিমার্গ পরিক্রমা।* বৌদ্ধ প্রকাশনা ট্রাস্ট, কলকাতা।

বাগচী প্রবোধ চন্দ্র (১৩৫৯)। *বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য।* বিশ্বভারতী, কলকাতা।

বিশী প্রমথনাথ (১৩৬৭,১৯৫৮)। *রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ ১ম ও ২য় খন্ড*। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা।

বিদ্যাভূষণ সতীশচন্দ (২০১৭)। *বুদ্ধদেব*। অরুণা প্রকাশন, কলকাতা।

বন্দোপাধ্যায় শ্রীকুমার (১৩৭২)। *রবীন্দ্র সৃষ্টিসমীক্ষা*। ওরিয়েন্টল বুক কোম্পানী, কলকাতা।

বঙ্গোপাধ্যায় শ্রী কুমার (১৩৬৭)। *বঙ্গোঁসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*। মডার্ণ বুক এজেন্সী (প্রা:) লি:, কলিকাতা।

ভট্টাচার্য উপেন্দ্রনাথ (১৪২৩)। *রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা*। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা।

শুদ্ধস্বত্ব বসু (১৩৮৫)। *বাংলা সাহিত্যের নানারূপ*। বিশ্বাস বুক স্টল, কলকাতা।

বিদ্যাভূষণ শ্রী সতীশচন্দ্র (২০০৩)। *বুদ্ধদেব*।মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা।

শাস্ত্রী হরপ্রসাদ (সম্পা) (২০০০)। *বৌদ্ধগান ও দোহা*। মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা।

শাস্ত্রী হরপ্রসাদ (১৯১৬)। *হাজার বছরের বৌদ্ধ গান ও দোহা*। শান্তিরঞ্জন প্রেস, কলকাতা।

শাস্ত্রী হরপ্রসাদ (১৯৮৪)। *রচনা সংগ্রহ তৃতীয় খণ্ড*। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা।

শাস্ত্রী ভিক্ষু শীলাচার (২০১২)। *মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন*। ময়নামতি আর্ট প্রেস, চট্টগ্রাম।

মহাথের বনশ্রী (১৪২৭)। বৌদ্ধধর্ম-দর্শন ও সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড। বাংলাদেশ বুদ্ধবাণী প্রচার বোর্ড, চট্টগ্রাম, পৃ. ২৩

মহাথের শ্রী জ্যোতিঃপাল (১৯৯৭)। *রবীন্দ্রসাহিত্যে বৌদ্ধসংস্কৃতি*। অন্তিকা প্রেস, চট্টগ্রাম।

মহাথের ধর্মপাল (২০১৬)। *সদ্ধর্মরত্নমালা*। রূক্কু শাহ ক্রেয়েটিভ পাবলিশার্স, ঢাকা।

মহাস্থবির ধর্মধার (১৯৭৪)। *বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*। মহাবোধি সোসাইটি, কলকাতা।

মুখোপাধ্যায় সুজিতকুমার (১৩৬৮)। *রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী-চীনভবন*। গীতবিতান পত্রিকা।

সমাজদার মণীন্দ্রনাথ (১৯৮৭)। *সংস্কৃত-প্রাকৃত-বিহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সেন প্রবোধচন্দ্র (১৯৫৩)। *ধম্মপদ-পরিচয়*। শৈলেন প্রেস, কলকাতা।

সেন প্রবোধচন্দ্র (১৯৪৭)। *ধর্মবিজয়ী অশোক*। পূর্বাশা লিমিটেড, কলকাতা।

সেন প্রবোধচন্দ্র ও শ্রীমন্তকুমার জানা (১৩৭২)। *সিংহল ও রবীন্দ্রনাথ*। সাপ্তাহিক বসুমতী, কলকাতা।

সেন প্রবোধচন্দ্র (১৯৬২)। ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ। প্রবর্তন প্রিন্টিং প্রেস, কলকাতা।

সেন সুকুমার (১৯৫৯)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।* ইস্টার্ণ পাবলিসার্স, কলকাতা।

রবীন্দ্র রচনাবলী ১ম খন্ড, *বিশ্বভারতী*, কলকাতা, ১৩৯৩।

রবীন্দ্র রচনাবলী ২য় খন্ড, *বিশ্বভারতী*, কলকাতা, ১৩৯৩।

রবীন্দ্র রচনাবলী ৩য় খন্ড, *বিশ্বভারতী*, কলকাতা, ১৩৯৩।

রবীন্দ্র রচনাবলী ৪র্থ খন্ড, *বিশ্বভারতী*, কলকাতা, ১৩৯৪।

রবীন্দ্র রচনাবলী ৫ম খন্ড, *বিশ্বভারতী*, কলকাতা, ১৩৯৪।

রবীন্দ্র রচনাবলী ৬ষ্ঠ খন্ড, *বিশ্বভারতী*, কলকাতা, ১৩৯৫।

রবীন্দ্র রচনাবলী ৭তম খন্ড, *বিশ্বভারতী*, কলকাতা, ১৩৯৫।

রবীন্দ্র রচনাবলী ৮ম খন্ড, *বিশ্বভারতী*, কলকাতা, ১৩৯৫।

রবীন্দ্র রচনাবলী ৯ম খন্ড, *বিশ্বভারতী*, কলকাতা, ১৩৯৬।

রবীন্দ্র রচনাবলী ১০ম খন্ড, *বিশ্বভারতী*, কলকাতা, ১৩৯৬।

রবীন্দ্র রচনাবলী ১১তম খন্ড, *বিশ্বভারতী*, কলকাতা, ১৩৯৬।

রবীন্দ্র রচনাবলী ১২তম খন্ড, *বিশ্বভারতী*, কলকাতা, ১৩৯৬।

রবীন্দ্র রচনাবলী ১৩তম খন্ড, *বিশ্বভারতী*, কলকাতা, ১৩৯৬।

রবীন্দ্র রচনাবলী ১৪তম খন্ড, *বিশ্বভারতী*, কলকাতা, ১৩৯৬।

রবীন্দ্র রচনাবলী ১৫তম খন্ড, *বিশ্বভারতী*, কলকাতা, ১৩৯৬।

রবীন্দ্র রচনাবলী ১৬তম খন্ড, *বিশ্বভারতী*, কলকাতা, ১৪০৭।

রবীন্দ্র রচনাবলী ১৭তম খন্ড, *বিশ্বভারতী*, কলকাতা, ১৪০৭।

রবীন্দ্র রচনাবলী ১৮তম খন্ড, *বিশ্বভারতী*, কলকাতা, ১৪০৭।

রায় নীহার রঞ্জন (১৩৬৯)। *রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ভূমিকা।* নিউ এজ পারলিশার্স, কলকাতা।

হালদার মনিকুন্তলা (১৯৯৬)। *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস। মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা।*

সহায়ক গ্রন্থ : ইংরেজি

Arnold, E. (1879). *The Light of Asia*. Trubner and Co, ludgate Hill, London.

Barua Sumangal (1997). *Buddhist Councils and development of Buddhism*. Atish Memorial Publishing Society, Calcutta.

Barua Sumangal, *Buddhist Councils and Development of Buddhism*.

Chalmers, R. (1993). *Majjhima-Nikaya,* Vol. II. Pali Text Society, London.

Davids C. P. F. Rhys (1975). *Visuddhimagga*. Pali Text Society, london.

Das, Asha (2000). *The Glimpses of Pali Literature*. Punthi Pustak, Calcutta.

Dutt R.C. (1900). *Civilization of India*. Visva-bharati Quarterly, 1943.

Davids Rhys, T.W. *Buddhist India. 6th ed. Buddhism,* 1st ed. *Hibbert Lectures,* 4th ed.

Davids Rhys (1995). *Digha Nikaya.* vol.I. Pali Text Society, London.

Davids T.W. Rhys and Carpenter J.estin (1967). *The Digha Nikaya.* Vol. 1. The Pali Text Society, 1967.

David.J. Kalupahana (1991). *Mulamadyamakakarika of Nagarjuna.* Motilal Banarsidass, Delhi.

Halder Manikuntala. *History of Buddhism (Sasanavamsa).*

Law B.C (2000*). A History of Pali Literature*. Rekha Printers Pvt. Ltd, New Delhi.

Law B.C. (1935). *Thupavamsakaya*. Pali Text Society, London.

Law B.C. (1945). *The Legend of the topes*. calcutta. ed and tr. N.A. JAYAWICKRAMA, SBB London, 1971.

Law B.C. (2000). *A History of Pali Literature*. Rekha Printers Pvt. Ltd, New Delhi.

Law B.C. (2000). *A History of Pali Literature*. Indica Books, Varanasi.

Law B.c. (Ed), (1935). *Thupavamsakaya*.Pali Text Society, London; Law B.C (1945) *the Legend of the topes*. calcutta ed. and tr. N.A. JAYAWICKRAMA, SBB London, 1971.

Oldenberg H. (1969) *Mahavagga*. Pali Text society, London.

Morris R. (1961, 1976). *Anguttara-Nikaya.* Vols. I-II. Pali Text Society, London.

Minayeff Professor (1986). *Ganadhavamsa*. Journal of the Pali Text Society, P.T.S. London, vol.2.

Norman K.R. A History of Pali Literature. Oskar van Hinuber, A Handbook of Pali Literature.

Rajendralala Raza (1824-91). *Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*. Asiatic Library, Calcutta.

Siddartha,R. *Mahavamsa in the Pali Literature* I.H. Q. Vol. VIII.

Sarkar, Sadhan Chandra *A Study on the Jatakas and the Avadanas.*

Shan Tan Yun. *Rabindranath,* the Gurudeva; Nair V.G. "Tan Yun-Shan Commemoration Volume.

Shan Tan Yun (1937-57). *Twenty Years of the Visva-Bharati Cheena-Bhavana*. Appendix One.

Shan TanYun. *My devotion to Rabindranath Tagore*; Nair V.G. *Yun-Shan Commemerotion Volume*.

Trenckner V. (1993). *Majjhima-Nikay.* Vol. I, Pali Text Society, London.

Winternitz M. (1991). A History of Indian Literature. voll. II, Munsiram Monohalal Publishers, New Dilhi, India.